মনের মতো গল্প

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শরৎ সাহিত্য ভবন

উপহার—

সূচীপত্র

চালিয়াৎ

এক

মণ্ট এসেছে মাসীর বাড়ী বেড়াতে।

গরমের ছুটি দীর্ঘ একমাসের উপর। হাফইয়ার্লি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, উপস্থিত এখন পড়ার ভাবনা নাই, নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে পারে।

তবু কয়েকখানা বই সঙ্গে নিতে হয়েছে। ছেলে যে এই একমাস পড়াশুনা না করে দিনরাত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে হৈ হৈ করে বেড়াবে, পিতা সেটা পছন্দ করেন নি। তাঁর আদেশে নিতে হয়েছে কয়েকখানা বই, খাতা, পেন্সিল, রবার, এমন কি ইন্‌স্ট্রুমেন্ট বক্সটা পর্যন্ত। পিতা কঠিন আদেশ দিয়েছেন, "জ্যামিতিটা ভালো ক'রে দেখো মণ্টু; মনে থাকে যেন—ক্লাস টেনএ পড়ছো, তোমাদের হাফ-ইয়ার্লি যেমনই হোক—ইয়ার্লি পরীক্ষা তেমন সহজ হবে না। তুমি অঙ্ক আর জ্যামিতিতে খুব কাঁচা, যাতে ফেল না হও সে চেষ্টা কোরো, তোমার হেড মাষ্টার বারবার করে বলে দিয়েছেন।"

 তালগাছের মত লম্বা, বিশ্রী রোগা ও খিটখিটে মেজাজ হেড মাষ্টারকে

একেবারেই পছন্দ করে না মণ্টু। দোষ না করেও হেডমাষ্টারের বিচারে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, শাস্তিও তাকে কম পেতে হয় না। নিচের ক্লাসে যখন পড়তো তখন বিশেষ অপরাধ না করলে হেড স্যারের দেখা মিলতো না, নাইন টেনএ সর্বদাই তাঁর সামনে থাকতে হয়।

বাস্তবিক হেড স্যার অত্যন্ত একচোখো। মণ্টু দেখতে পায়—ভূপাল, ঝণ্টে, ভণ্টেকে তিনি একটি দিন শাস্তি দেন না, অথচ টিপে টিপে অপরাধ করে তারাও বড় কম নয়। হেড স্যার বলেন—এরা তাঁর স্কুলের রত্ন, প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, তারা নাকি ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যত দোষ সবই নাকি মণ্টুর। সে কোন রকমে প্রায় কেঁদে কেটে ক্লাসে ওঠে, কারও সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে পারে না, কদর্য ভাষা, সব সময় ব্যবহার করে এবং সে অনেক ছেলেকে দলে টেনে অধঃপাতে দিচ্ছে।

হেড স্যার শাসনও করেন তেমনিই; কতদিন তাকে লাষ্ট বেঞ্চে একা বসে পেনালটি নিতে হয়। এ যে কতবড় অপমান তা মণ্টুই জানে।

অসহ্য হয়ে উঠেছে তার স্কুল, সে আর এ স্কুলে যেতে চায় না। এ পরীক্ষায় সে চারটি সাবজেক্টে ফেল করেছে, এ কেবল হেড স্যারের একচোখোমির জন্যই হয়েছে, মণ্টু স্পষ্টই এ কথা বলে।

পরীক্ষার রেজাল্ট বার হওয়ার সময় সে একবার মুখ তুলে ভূপাল, ঝণ্টে, ভণ্টের দিকে তাকিয়েছিল। তাদের মুখে যে হাসি সে ফুটতে দেখেছিল, তাতে তার মনে হয়েছিল ধরণী দ্বিধা হয়ে যাক, সে তার মধ্যে আত্মগোপন করুক।

রেজাল্ট আউট হবার পর দুদিন সে বাড়ীর বার হয়নি। এ লজ্জা শুধু তার একার নয়, তার গ্র্যাজুয়েট পিতার এবং ম্যাট্রিক পাস মায়েরও।

পিতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, "যাক, এজন্যে আমি তোমায় কিছু বলতে চাইনে, আমি দেখতে চাই তুমি এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কি রেজাল্ট কর। যদি সে পরীক্ষায় পাস না করতে পারো, তোমায় তোমার মাসীমার বাড়ী গিয়ে পড়তে হবে, কলকাতায় আমার মুখে কালি দিতে আমি রাখবো না।"

কি কাজে মেসোমশাই একদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, পিতা তাঁকে জানালেন, "মণ্টু আপনার সঙ্গে ওখানে যাচ্ছে, ওখানকার স্কুলটা ওকে দেখাতে বলবেন গোবিন্দ গোপালকে, সামনের বছরে হয়তো আপনার ওখান থেকেই ওকে পড়তে হবে।"

মণ্টুর মুখখানা অপমানে লাল হয়ে যায়।

মেসোমশাইয়ের সঙ্গেই সে চলে যায় মাসীর বাড়ী শক্তিপুরে। মেসোমশাই বড় সরল ও উদার হৃদয় মানুষ, বললেন, "বাপ-মা রাগ করে অনেক কথাই বলে থাকেন, তাই বলে সত্যি তোকে আমাদের গ্রামে পাঠাবেন না। মন দিয়ে ভালো করে পড়াশুনা কর ঠিক পাস করে যাবি, চাই কি বৃত্তিও পেয়ে যাবি।"

দুই

শক্তিপুর গ্রামের নাম মণ্টু অনেকবার শুনেছে। খুব ছোটবেলায় একবার মায়ের সঙ্গে নাকি এসেওছিল, সেকথা আজ তার মনে নাই। গ্রামটা বেশ বড়, আরও ঘন বসতি হয়েছে দেশবিভাগের পরে। হাই স্কুলটা স্থাপিত হয়েছে মাত্র বারো-তেরো বৎসর হবে।

মাসীমার তিনটি ছেলে, জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ মণ্টুর ক্লাসে পড়ে, মেজ গোপাল ক্লাস এইটে এবং ছোট যজ্ঞেশ্বর পড়ছে ক্লাস টুতে।

মেসোমশাইয়ের মতই ছেলেরা হাবাগোবা ধরণের, চটপটে তারা মোটেই নয়। সন্তর্পণে তারা চলাফেরা করে, আস্তে আস্তে তারা কথা বলে। বাড়ীতে যে তিনটি ছেলে আছে বাইরে হতে কেউ তা বুঝতে পারে না,—গোলমাল, ঝগড়া-বিবাদ কিছুই শোনা যায় না। শোনা যায় শুধু মাসীমার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, একা তিনিই এত বড় বাড়ীটাকে সরগরম করে রেখেছেন।

কি বিশ্রী সব গ্রাম্যনাম—গোবিন্দ, গোপাল, যজ্ঞেশ্বর। ক্লাস টুর ছেলে যজ্ঞেশ্বর নিজের নাম বানান করতে ঘেমে ওঠে, লেখা তো দূরের কথা।

পোষাক পরিচ্ছদও এদের তেমনি। ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল—যাকে সচরাচর কদমছাঁট বলা হয়। গায়ে ছেঁড়া আধময়লা গেঞ্জি, হাঁটুর কাছে পড়ে ধুতি। পায়ে কদাচিত স্যাণ্ডেল দেয়, বেশীর ভাগ খালি পায়ে হাঁটে।

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে মন্টু।

একেবারে বুনো জংলী দেশ; হাইস্কুল থাকলে হবে কি, মানুষ-জন আজও সভ্য হয়নি—আজও তারা সেই সেকালকে আঁকড়ে পড়ে আছে। জুতো পরে ঘরে ঢোকা চলবে না, বাইরে বেড়িয়ে এসে পা ধুতে হবে—মাসীমার কড়া শাসন।

মন্টু জানে মেসোমশাই একেবারে ইংরাজী জানেন না, খাঁটি বাংলায় তিনি কথাবার্তা বলেন। মন্টু কথার মধ্যে দু-চারটে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করলে শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, "ও ভাষা আর কেন বাপু? বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষা এড়িয়ে অন্য ভাষায় কথা বলবার দরকারটা কি?"

মন্টু উত্তেজিত হয়, তর্ক করে, "তবে ইংরাজীটা একেবারে বাদ দিলেই হয়, স্কুল কলেজে পড়বার দরকারটা কি? বাংলাতেই যখন সব কিছু হচ্ছে—" বাধা দেন মেসোমশাই, বলেন—"কিন্তু ওটা বাদ দেবারই বা দরকার কি,—সাহিত্য হিসাবে ইংরাজী রাখতেই হবে যে। তা ছাড়া ধর—তুমি যদি ইউরোপ আমেরিকা বা আর কোন দেশে যাও, সেখানে এই ভাষার মাধ্যমে কথা বলতে হবে, পড়াশুনাও এই ভাষার সাহায্যে হবে। বিদেশে বাংলাই বল আর হিন্দী উর্দুই বল—কোন ভাষাই চলবে না। ইংরাজি সাহিত্য সত্যিই বড় চমৎকার, কত বড় বড় কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, কত মহাপণ্ডিত বিজ্ঞানবিৎ এই ভাষায় লিখেছেন, যা বড় হয়ে পড়ে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে। সাহিত্য হিসাবে ইংরাজি পড়তে হবে বই কি, তবে যতদূর পারা যায়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে ওটাকে বাদ দিয়ে চল।"

মন্টু মনে মনে ফুলতে থাকে, মুখে কিছু বলে না।

গোবিন্দ গোপালের মত গবেট ছেলে, বাইরের জ্ঞান এদের বিন্দুমাত্র নাই, বই পড়ে এরা মানুষ চেনে, পৃথিবীর পরিচয় পায়। গ্রামের আদ্যিনাড়ির খবর এরা রাখে, স্কুলের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ।

মণ্টু মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা মাসীমা: আপনি নিশ্চয়ই কিছু লেখাপড়া জানেন, ছেলেদের এমন নাম রেখেছেন কেন? দুনিয়ায় কত ভালো ভালো নাম আছে, আপনারা সে সব বাদ দিয়ে ওদের নাম রেখেছেন গোবিন্দ, গোপাল, যজ্ঞেশ্বর,—যে সব নাম শুনলে কলকাতার লোকেরা হেসে লুটিয়ে পড়বে।"

মাসীমা একটু হাসলেন, বললেন, "কিন্তু নামগুলো তো নেহাৎ খারাপ নয় মণ্টু, এ সব যে ঠাকুর দেবতার নাম, সকালে উঠে ওদের ডাকলেও কাজ হয়। তোমার নাম মণ্টু,—হিমেলকান্তি ও সব নাম সহর বাজারে চলতে পারে বাবা, পাড়া গাঁয়ে চলে না।"

মণ্টু বললে, "কিন্তু ওরা তো সহরের কলেজেই পড়তে যাবে, তখন ছেলেরা ভীষণ ঠাট্টা করবে। তা ছাড়া ওদের কি অদ্ভুতভাবে রেখেছেন,—পায়ে জুতো দেয় না, কদমছাঁট মাথার চুল; আট হাত, ন হাত ধুতি পরে গোবিন্দ গোপাল, দুদিন বাদে যজ্ঞেশ্বরও অমনি ধুতি পরবে তো।"

মাসীমা অক্লেশে বললে, "তা পরবে বই কি বাবা, দেশের ছেলে ওরা—দেশের পোষাক পরবে তাতে তো লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ওরা এমনি ভাবেই বড় হবে, মানুষ হবে, দেশের দশের উন্নতি করবে, বিলাসিতা করবার জন্যে ওরা কেন,— কোন ছেলেই জন্মায় নি। ওই বিলাসিতায় কত পয়সা নষ্ট হয়, সেটা একবার হিসেব করে দেখো।"

মণ্টু আর কথা বলে না।

তিন

মণ্টুকে প্রথম দেখে অবাক হয়ে যায় গোবিন্দ গোপাল ও যজ্ঞেশ্বর।

পায়ে চকচকে সু, সর্বদা চলাফেরার জন্য স্যাণ্ডেলও এনেছে। মাথার চুল ছোট বড় করে ছাঁটা, পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে অন্ততঃ পক্ষে কুড়ি পঁচিশ মিনিট লাগে। ধুতি সে পরে না, সুন্দর সুন্দর হাফপ্যান্ট, ফুলপ্যান্ট, চমৎকার

সার্ট পাঞ্জাবী গেঞ্জি সব সে এনেছে। এরও উপর আছে পাউডার ক্রিম সেন্ট প্রভৃতি,—এককথায় সহরের চৌকোস ছেলে মণ্টু।

কথাও সে বলে অনর্গল, সত্য এবং মিথ্যা জড়িয়ে সে অনেক কথাই বলে।

সেদিন সকালে তাকে বেড়াতে নিয়ে যায় গোবিন্দ, একটা মস্ত বড় পুষ্করিণী দেখিয়ে সে সগর্বে বললে, এত বড় পুকুর তোমাদের কলকাতায় নেই মণ্টু। জানো এই পুকুরটা দু-বার ঘুরলে তিন মাইল ঘোরা হয়ে যায়। রাজা টোডরমল যখন বাংলায় এসেছিলেন, এ গ্রামের লোকদের ভীষণ জলকষ্ট দেখে তিনি এই পুকুরটা খুঁড়িয়েছিলেন। মাঝখানে ওই যে সাদা উঁচু জায়গাটা দেখছো; ওখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লোকে বলে ওর মধ্যে নাকি এক কলসী মোহর পোতা আছে।"

হেসে ওঠে মণ্টু, বিদ্রূপের সুরে বললে, "যত সব গাঁজাখুরি কথা—তোমরা পাড়াগাঁয়ের লোক কিনা—তার এ কথা বিশ্বাস কর, আমরা কলকাতার ছেলে এ সব কথা বিশ্বাস করি নে।"

বড় আঘাত পেয়ে গোবিন্দের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে যায়।

গোপাল এগিয়ে আসে, বললে, "কিন্তু এতবড় পুকুর আছে তোমাদের কলকাতায়?"

অবহেলার সুরে মণ্টু বললে, "ভারি তো এতটুকু একটা পুকুর, তার গর্বেই তোরা গেলি। যাস আমাদের কলকাতায়—দেখে আসিস রবীন্দ্র সরোবর, ঠিক এর চার ডবল হবে। দেখে আসবি একবার, মাথা তোর ঘুরে যাবে।"

তারপর গল্প করে সেই রবীন্দ্র সরোবরে সাঁতারের প্রতিযোগিতায় সে কতবার জয়লাভ করেছে, কত মেডেল যে সে পুরস্কার পেয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

গোবিন্দ মুষড়ে পড়েছে, দুষ্ট গোপাল বলে, "যাদের সঙ্গে তুমি সাঁতার দিয়েছো, তাদের নাম কি মণ্টুদা?"

মণ্টু হেসে ওঠে, "দূর দূর,—তাদের নাম কি মুখস্থ করে রেখেছি নাকি? সাঁতার কাটবার—সাঁতার দিয়েছি, প্রাইজ নেওয়ার নিয়েছি, মা সে সব আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছেন।"

তারপর মহোৎসাহে সে বলে যায় তাদের ক্লাবের ফুটবল খেলায় সে দলের অধিনায়ক, আর সে টিমটা তারই হাতে তৈরী, সে না হলে খেলাই হয় না। কত জায়গায় সে টিম নিয়ে খেলতে গেছে—জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, পশ্চিম দিনাজ-পুর, কুচবিহার, সব জায়গায় জয়ী হয়েছে, কত শীল্ড কত মেডেল তারা পেয়েছে। তাদের স্কুলে মণ্টু না হলে চলে না, স্যারেরা তার নাম করতে অজ্ঞান। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, জাম্পিং—সব তাতেই স্যারেদের মণ্টুকে চাইই। এর ফলে পড়াশুনার ক্ষতি বড় কম হয় না, সেইজন্যই তাকে জোর করে এখানে পাঠিয়েছেন—আবার খেলা আসছে কিনা; দত্তপুকুরের টিম এবার খেলতে আসছে। বাবা ভীষণ চটে গেছেন, বলেছেন ছুটিতে মাসীমার বাড়ী গিয়ে ভালো করে পড়াশুনা করতে হবে।

গোবিন্দ ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের গাঁটাকে নিশ্চয় তোমার ভাল লাগছে না মণ্টু?"

মণ্টু বিকৃত মুখে বলে, "দূর দূর, সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। কিই বা আছে তোমাদের এখানে তা বল। ওই এক পুকুর, গোটাকত বাড়ী আর জনকত মানুষ, গাছপালা, ধানের জমি। চল আমাদের কলকাতায়, কত বাড়ী, কত লোক, ট্রাম, মোটর, রিক্সা, বাস, দেখবে ইলেক্‌ট্রিক লাইটে সব উজ্জ্বল; কত সিনেমা, থিয়েটার, কত বড় গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম কত বড় লাটসাহেবের বাড়ী। তোমাদের এখানে কিই বা আছে। যা তোমরা পড়েই শেখো, চোখে কিছু দেখেছো?"

তিনটি ভাই নির্বাকে এ ওর পানে তাকায়।

চার

সেদিন মেসোমশাইয়ের হা'তে অমৃত বাজার পত্রিকাখানা দেখে সে বিলক্ষণ কৌতুক অনুভব করে।

জিজ্ঞাসা করে, "ও কাগজ কি করবেন মেসোমশাই?"

শান্ত হেসে মেসোমশাই বললেন, "ওই যে—রুষ দেশের সেই গ্যাগারিণ যে এরোপ্লেনে সারা পৃথিবী ঘুরেছে, সে কলকাতায় আসবে কি না ;—তার ছবি ছেপেছে শুনলাম, তাই গোবিন্দ গোপালদের দেখাতে নিয়ে এলাম।'

মন্টু উদার কণ্ঠে বললে, "শুধু ছবি দেখে কিই বা বুঝবেন মেসোমশাই, আমাকে দিন—আমি পড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।"

মেসোমশাইয়ের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তিনি বলেন, "তাই বটে, পড়ে বুঝিয়ে দাও তো বাবা, মুখ্যু মানুষ, বাংলাটা ভালো বুঝলেও ইংরাজীটা তো বুঝিনে। পড়ে বাংলায় তর্জমা করে দাও, যজ্ঞেশ্বরকে বুঝাতে পারব।"

একটু থেমে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আর গোবিন্দ গোপালেরও বিদ্যে তথৈবচ, পড়ার বই টেনে টুনে তবু পড়ে, খবরের কাগজ পড়বার যোগ্যতা যদি এতটুকু থাকে। হাজার হোক—পাড়াগাঁয়ের ছেলে তো, তোমরা হচ্ছো কলকাতা সহরের ইস্কুলের ছেলে, বাইরের জ্ঞান তোমাদের কত।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে মন্টু কাগজখানা নেয়, তারপর টেনে টেনে পড়তে সুরু করে, কত জায়গায় বানান করে ও তাকে পড়তে হয়, কত ভুল অর্থ করে বাংলায় বলতে হয়।

নিঃশব্দে শুনে যান মেসোমশাই, মুখে তাঁর এতটুকু ভাবান্তর দেখা যায় না। কত জায়গায় জিজ্ঞাসা করেন, মন্টু যা উত্তর দেয়, তাতেই খুশী হন তিনি।

জয়ীর গর্বে মন্টুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মনে পরম তৃপ্তিলাভ করে—বেচারী মেসোমশাইকে সে আজ অনেক জ্ঞানদান করতে পেরেছে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় গোবিন্দ সোল্লাসে জানায়—"জানো মন্টু, সামনের হপ্তায় এখানে যে সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে, আমি তাতে তোমার নাম দিয়ে এলাম। আমাদের নটে, ঘনা, মঙ্গলা খুব লাফালাফি করছিল, ওদের কে ভাই আছে নামকরা সাঁতারু মনা ঘোষ না টুনে ঘোষ, সে এখানে আসছে। সে নাকি চ্যালেঞ্জ করেছে যে তাকে সাঁতারে হারাতে পারবে, সে নিজে তাকে পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড দেবে। এখানকার অনেকে নাম দিয়েছে, আমিও তোমার নাম দিয়ে এসেছি।"

গোপাল সগর্বে বললে, "ওদের হারাতেই হবে মন্টুদা, ওদের অহংকার ভাঙ্গতেই হবে। মাঝে তো আর চারদিন, সামনের রবিবার সাঁতার, তুমি এর মধ্যে তৈরী হয়ে নাও।"

কাষ্ঠ হাসি হাসে কলকাতার ছেলে মন্টু, ভিতরে ভীষণ রকম মুসড়ে পড়লেও মৌখিক উৎসাহ দেখায়।

সাঁতার দেওয়া চুলোয় যাক, মন্টু কখনও জলে নামেনি। জন্মে পর্যন্ত কলের জলে স্নান করে সে, সাঁতারের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই তার।

এরা তার কি সর্বনাশ করলে তাই ভাবে সে। এরপর গোপালের ফুটবল ম্যাচ আছে; গোপালনগর টিমের সঙ্গে মন্টুকে খেলতে হবে; তারপর আছে ভলিবল—আরও কত কি এসে জুটবে কে জানে। এখানে আসা এবং আত্মপ্রচার করাই হয়েছে মন্টুর ঝকমারি।

কিন্তু মুখে সে দমে না।

এখানকার ছেলেরা তাকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ঠাউরেছে, তারা সর্বদা তাকে ঘিরে থাকে, তার একটা কথা শুনবার জন্য তারা উদগ্রীব। শোনে—কবে মন্টু নিজের জীবন বিপন্ন করে চলন্ত মোটরের সামনে থেকে ছোট একটি ছেলেকে বাঁচিয়েছে, কবে একজন অন্ধকে সন্তর্পণে ধরে তার বাড়ীতে পৌছে দিয়েছে; পরার্থপরতার সেই সব গল্প শুনে গ্রামের ছেলে মুগ্ধ হয়।

স্কুলের শিক্ষকেরা ছেলেদের মুখে মন্টুর অদ্ভুত দক্ষতার কাহিনী শোনেন; মানতেই হয় তাঁদের—হাঁঃ সহরের ছেলেরা চৌকোশ হয় বটে, গ্রামের ছেলেরা কোনদিক দিয়ে তাদের নাগাল পায় না।

ছোট বড় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মন্টু, বাদ গেছেন শুধু তার মেসোমশাই। মন্টু যে বড় কেওকেটা নয়, সে কথা শুনবার তাঁর সময় নাই, এ সম্বন্ধে কোন কথাও কোনদিন তিনি বলেন না।

বেচারা মুখ্যুসুখ্যু গ্রামের মানুষ,—একেবারে সেকেলে মত তাঁর, আধুনিক কালের কিছু বুঝবেন কি করে? নিজের মান বাঁচিয়ে তাই তফাৎ হয়ে থাকেন।

হায় বেচারা, চোখ থাকতেও চোখ নাই। ছেলেরা যখন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করে, তখন তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে মাঠের তদারক করতে বার হন।

পাঁচ

অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে মণ্টু, মুখের হাসি তার মিলিয়ে গিয়ে মলিন হয়ে গেছে মুখখানা।

মায়ের পত্র এসেছে, তিনি দারুণ অসুস্থ, মণ্টুকে পত্র পাঠ কলকাতায় ফিরতে লিখেছেন, যেন সে একটু বিলম্ব না করে। এ পত্র পাওয়ার পর মণ্টুর আর এখানে থাকা উচিত নয়।

আন্তরিক দুঃখিত হয় মণ্টু, গোবিন্দের হাত দুখানা ধরে বললে, "কিছু মনে করো না ভাই গোবিন্দ, খেলাধূলার চেয়ে মা যে অনেক বড় সে কথা তুমিও জানো, মা গেলে আর মা হবে না। আমি কথা দিচ্ছি নেক্স্ট সিজনে তোমাদের এখানে এসে সাঁতার দেব—খেলব, কিন্তু এবার আর হল না, সেজন্যে আমায় ক্ষমা কোর।"

তার চেয়ে বেশী দুঃখিত হয় গোবিন্দ ও গোপাল। একখানা গ্রামে নয়, পনেরো খানা গ্রামে ছেলেরা মুখে চোং লাগিয়ে প্রচার করে এসেছে—বাংলা দেশের কৃতি সন্তান, বিখ্যাত সাঁতারু হিমেলকান্তি বা মণ্টুবাবু সাঁতারের প্রতিযোগিতায় নামছেন, অতএব সকলে দলে দলে আসুন, দেখুন—আনন্দ লাভ করুন।

দলে দলে সেই সব ছেলেরা ছুটে আসে।

আগামী কাল সকালে সাঁতার সুরু হবে, সাঁতারুর দল সবাই এসে গেছে অথচ আজ বৈকালে মণ্টু চলে যাচ্ছে কলকাতায়,—এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

ছুটে আসেন সেকেণ্ড স্যার নীলরতন—তাঁর খেলা ধূলায় প্রচণ্ড উৎসাহ। গতকাল কলকাতায় গিয়ে তিনি মেডেল কিনে এনেছেন, যে সাঁতারে প্রথম হবে তাকে এই মেডেল দেওয়া হবে।

মুখখানা বড় বিমর্ষ হয়ে যায় মন্টুর, করুণকণ্ঠে সে নিজের অবস্থা জানায়।

মায়ের বাড়াবাড়ি অসুখ, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না।

ছেলেরা মন্টুকে ঘিরে নিয়ে যায় দুই মাইল দূর ষ্টেশনে, সেকেণ্ড স্যার নিজে টিকিট কেটে দেন, ট্রেন এলে তাকে তুলে দিয়ে আবার আসবার অনুরোধ করেন।

হুইসল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়।

যতক্ষণ দেখা যায়, মন্টু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল উড়ায়।

তারপর মহা আরামে রুমালে মুখ মুছে বেঞ্চে বসে পড়ে, স্বস্তির হাসি তার মুখে ফোটে—"বাবাঃ, বাঁচলাম।"

আর কখনও নয়, কোনদিন সে এখানে আসছে না। ধবে বেঁধে যদি ওই পুষ্করিণীতে নামিয়ে দিত, হাঁটু জলেই যে সে ডুবে মরতো।

আসার সময় গোবিন্দ পড়বার জন্য তাকে কয়খানা বই প্রেজেন্ট করেছে, সব কয়খানা লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সে ফিতা খোলে।

প্রথম বইখানা খুলেই সে চমকে বিবর্ণ হয়ে গেল।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই মেসোমশাইয়ের ফটো, নিচে তাঁর নাম—ডক্টর কুমুদবন্ধু রায়, এম-এ, পি আর এস, পি এইচ ডি অধ্যাপক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটী।

পরের পৃষ্ঠায় উৎসর্গ পত্র।

ডক্টর সুধাময়ী রায়—এম-এ, পি এইচ ডি—

মাসীমা—তার রান্নাঘর নিয়ে সদাব্যস্ত মুখরা মাসীমা, এবং রিক্তপদে মাঠে মাঠে কৃষাণদের সঙ্গে কর্মরত সেই হাবাগোবা মেসোমশাই।

বইখানা কখন হাত হতে পড়ে যায়।

দুইহাতে মুখ ঢাকে মন্টু, তার লজ্জা রাখবার স্থান নাই।

দক্ষযজ্ঞ

এক

গ্রামের বুকে মহা হৈ হৈ ব্যাপার।

সামনে আসছে দুর্গাপূজা, চাঁদা তোলার ব্যাপার চলেছে বৎসরের প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ মাস হতে। দলের প্রধান অর্থাৎ সভাপতি বৃদ্ধ যাদবেন্দ্র বোস। ছেলে ছোকরার ব্যাপারে প্রথমটা তিনি আসতে চান নি, কিন্তু তাঁর পৌত্র জিতেন তাঁকে রেহাই দেয় নি, অবশেষে তার জন্যই যাদবেন্দ্র বোস সভাপতি হতে রাজি হয়েছেন।

পাকা কথাটা বলেছেন তিনি,—বছরের প্রথম হতে চাঁদা তুলবার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে ছেলেদের এতে মহাউৎসাহ, তারা পালা করে এক একজন বিভিন্ন পাড়ার ভার নিয়েছে।

পূজা এবার আশ্বিনের শেষে,—তা হোক, আগে হতে তোড়জোড় করা ভালো।

জিতেনের বন্ধু শিবু সাউ বলে, "তোর দাদুর মাথায় বুদ্ধি আছে রে জিতু,—বছরের প্রথম হতে চাঁদা তোলার মতলব দেওয়ায় অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে।"

জিতু বা জিতেন গর্বের হাসি হেসে বলে, "হবে না? দাদুর ওই বুদ্ধির জন্যেই নাকি কুড়ি বছর বয়েস হতে চুল পাকতে সুরু করে তিরিশ বছর বয়েসে বিলকুল সাদা হয়ে গেছে দিদু এ কথা বলেছে।"

বিপিন মোড়ল ছেলেদের পিঠ চাপড়ায়,—বলেছে "খুব ভালো কাজ করছো বাবাজীরা, মাথায় গামছা দিয়ে এমনভাবে চাঁদা আদায় করতে আমরা পারি নি;—তোমরা আজকালকার ছেলেরা অসাধ্য সাধন করছো।"

কিন্তু শুধু পূজা করলেই তো হবে না, তার সঙ্গে আর কিছু আনন্দ অনুষ্ঠান করা চাই যাতে বিশখানা গাঁয়ের লোক পূজো দেখতে এসে খানিকটা আনন্দ লাভ করবে।

অনেক ভেবে বেহারী বললে, "একটা কের্তন দিলে হয় না?"

বিকৃত মুখে সেক্রেটারী লোকনাথ বললে, "কের্তন একদম পচে গেছে, ও কেউ শুনবে না বাপু শুধু শুধু কের্তনীয়াদের খাওয়ানো, থাকার ব্যবস্থা, সব শেষে দক্ষিণায় সব খরচ হয়ে যাবে।

কেলো বললে, "তবে গান বাজনার ব্যবস্থা হোক, হার্মোনিয়াম তবলা সেতার বেহালা নিয়ে গান চলুক;—"

ছেলেরা মহাখুসি—তারা আবৃত্তি করবে আগে হতে কথাটা লোকনাথকে শুনিয়ে রাখলে।

লোকনাথ কলক্রাতার কলেজে পড়ে—তার নাকি অসীম বুদ্ধি—বয়স কম হলে কি হবে। দলের চাঁই সে, কি রকম ভাবে অতগুলি ছেলেকে এক করে প্রত্যেকের উপর এক একটা কাজের ভার দিয়েছে। সে সব কাজ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা সে খবর নিতে সে ফি শনিবারে কলকাতা হতে দেশে আসে।

এবারকার পূজার ভার নিয়েছে তরুণ ছেলেরা—বৃদ্ধেরা কেবল পরামর্শ দিয়েই ছুটি, তাঁরা দেখছেন এরা কি রকম কাজ করে।

কিন্তু এরই মধ্যে বেহারী প্রস্তাব করে বসলে, "পূজোর সময় মহাষ্টমীর দিনে যাত্রা হলে কেমন হয়?"

"চমৎকার—চমৎকার।"

ছোট বড় সব ছেলেই হাততালি দেয়, বোঝা যায় প্রস্তাবটা তারা সকলেই সমর্থন করছে।

যাত্রার বই নির্বাচন চলে।

লোকনাথ প্রথমটায় একটু খুঁত খুঁত করে। কলকাতার কলেজে পড়ে সে, যাত্রাকে আমল দিতে চায় না, থিয়েটার হলে ভালো হয়।

কেলো বলে, "থিয়েটারের চেয়ে যাত্রাই ভালো—এতে ষ্টেজ বাঁধতে হয় না, সিনের বালাই নেই, তার চারিদিকে যারা বসবে সবাই দেখতে পাবে। আমাদের ষ্টেজই বা বাঁধছে কে, আর সিনই বা যোগাড় করছে কে? তার চেয়ে যাত্রাই হোক বাপু, কোন ঝামেলা নেই।"

কিন্তু বই—কোন বই হবে?

সেও তো ভাবনার কথা। এমন নাটক হওয়া চাই যা সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করবে, বড় ছোট মেয়ে, শিশু সকলেই যে নাটক দেখে মুগ্ধ হবে।

আগে হতে বই সিলেক্ট করে পার্ট মুখস্থ করা দরকার। এ তো থিয়েটার নয় যে উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে কেউ পার্ট বলে দেবে—নায়ক বা নায়িকা শুনে মুখস্থ বলে যাবে। এর নাম যাত্রা, জলের মত পার্ট মুখস্থ হওয়া চাই, একটুও যেন না বেধে যায়।

বই সিলেক্ট করার ভার নিলে সেক্রেটারী লোকনাথ। বইয়ের কয়েকটা নাম দেখে পড়ে সে সামনের ছুটিতে নিয়ে আসবে ও রিহার্সাল আরম্ভ করে দেবে।

ছেলেরা অত্যন্ত খুশী হয়—এর জন্যেই কেউ কেউ যে কোন নাটক নিয়ে রিহার্সাল দিতে সুরু করে।

দুই

গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে বই নিয়ে এসেছে লোকনাথ,—বইয়ের নাম লব-কুশের যুদ্ধবিজয়,—চমৎকার বই—আসরে জমবে ভালো।

খুব খুসি হয় জিতেন শিবু কেলো রামু প্রভৃতি। পাত্রপাত্রী নির্বাচন করতেই লেগে যায় কয়েকটা দিন।

লোকনাথ নিজের পার্ট ঠিক করে রেখেছে, সে নিজে রামের পার্টে নামবে, লব ও কুশ দুটি ছোট ছেলে অনেকের মধ্য হতে সে নিজে নির্বাচন করে নিলে। সীতার পার্টে শিবু সাউকে চমৎকার মানাবে, তার আকৃতি প্রকৃতি এমন কি কণ্ঠ-স্বরটা পর্যন্ত মেয়েদের মত। ছোট ছোট কদমছাঁট চুলের উপর পরচুলা বসিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে, অতএব চুলের জন্য ভাবনা নাই কৌশল্যার পার্ট কম; দুই একটা দৃশ্যে অবতীর্ণ হবে, সে পার্টে নামবে মধুসূদন।

জিতেন আপত্তি করে—"মধু বড্ড লম্বা আর রোগা ওকে কি কৌশল্যার পার্টে মানাবে?"

উদার কণ্ঠে লোকনাথ বললে, "খুব মানাবে, না মানালে চলবে কেন? মধু পাঁচটাকা চাঁদা দিয়েছে, ওকে ভালো পার্ট দিতেই হবে।

যথাযোগ্য চাঁদা ধরে পার্ট বিতরণ হয়।

একটা যাত্রার দল গড়া মুখের কথা নয়। নায়ক-নায়িকা, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রায় চল্লিশজন লোক চাই। অবশ্য এদের মধ্যে মেন পার্ট রাম, লবকুশ, সীতা লক্ষ্মণ, বাল্মিকী ও নারদের।—

বাল্মিকী পাওয়া প্রথমটা মুস্কিল হলেও বিশেষ বেগ পেতে হল না। বাল্মিকী তিন চার জায়গায় আসবেন—কথাও তার কিছু কিছু আছে, তবু এ পার্ট নিতে রাজি হল কেলো।

কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হল নারদের পার্ট কে নেবে?

নারদের হাতে থাকবে একতারা,—নারদের হরিনাম গান আছে, তারপর আছে বিবাদ বাধানোর প্রচেষ্টা। এই শক্ত পার্ট নিতে কেউ চায় না।

মুস্কিলে পড়ে যায় লোকনাথ।

সকলকে লক্ষ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, "আমিই নারদের পার্ট নিতে পারতাম,—কিন্তু রামের শক্ত পার্ট তোমাদের করা চলবে না—অর্থাৎ তোমরা

পারবে না। নারদ সে হিসাবে বড় কম নয়, একনম্বর তিনি হরিভক্ত, সব সময় তাঁর মুখে হরিনাম গান থাকবে, তা ছাড়া তাঁর স্বভাবটা হবে ক্রুর ধরণের, পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বাধাবার চেষ্টায় তিনি থাকবেন। এ পার্ট যাকে তাকে দেওয়া যায় না,—কাজেই তোমরা ভেবে দেখ—কে নেবে।

স্কুলের আরদালির ছেলে ক্লাস নাইনের ছাত্র রামসুকুল এগিয়ে আসে। এতক্ষণ সে সকলের পিছনে বসে অভিমানে ফুলছিল, এবার সাহস করে এগিয়ে আসে।

রামভজনের ছেলে রামসুকুল—

নামে হিন্দুস্থানী হলেও সে বাঙ্গালী হয়ে গেছে। পিতা তার আজও হিন্দুস্থানী ধরণে কাপড় কুর্তা পরে, মাঝে মাঝে মাথায় পাগড়ি আঁটে, পায়ে দেয় নাগরা জুতা। চিরকাল বাংলাদেশে বাস করেও বাংলা ভাষা ভালো করে বলতে পারে না। তারই ছেলে রামসুকুল জন্মেছে এখানে, মানুষ হয়েছে বাঙ্গালীদের সঙ্গে, পড়ে সে বাঙ্গালীর স্কুলে, কথায় বার্তায়, আচার ব্যবহারে সে সর্বাংশে বাঙ্গালী হয়ে গেছে। গত বৎসর ক্লাস এইটের পরীক্ষায় বাংলায় সে যা রেজাল্ট করেছে, এ রকম বাঙ্গালী ছেলেরাও করতে পারে নি।

রামসুকুলকে দেখে লোকনাথের চোখ দুটি বড় হয়ে ওঠে, বললে, "কি রে, তুই কি চাস?"

রামসুকুল স্পষ্টই আবেদন জানায়—"নারদের পার্ট আমায় দাও লোকুদা; আমি ও পার্ট করতে পারব।"

"তুই—তুই করবি নারদের পার্ট—বলছিস কি রে রামসুকুল,—পারবি?"

বুকে চড়মেরে দৃঢ়কণ্ঠে রামসুকুল বললে, "আলবৎ পারব। চাঁদা হয় তো বেশী দিতে হবে, তা আমি দেব লোকুদা, আমার আটটা টাকা আছে।"

লোকনাথের মুখে স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে—সে অন্য ছেলেদের দিকে মুখ ফিরায়, কঠিনকণ্ঠে বলে, "ছি ছি কি লজ্জা, তোমরা কেউ নারদের পার্ট নিতে চাইলে না, আর বাঙ্গালী না হয়ে রামসুকল মোটা চাঁদা দিয়েও সেই পার্ট করতে চাচ্ছে।"

ছেলেরা মুখ নামায়।

রামসুকুলের পিঠ চাপড়ে লোকনাথ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "বেশ, তুমিই নারদের পার্ট নেবে। কিন্তু জানো তো রামসুকুল, শুধু কথা বলা নয়, নারদকে বীণা বাজিয়ে হরিনাম গান করতে হবে, মাঝে-মাঝে একটু আধটু নাচতেও হবে। বড় শক্ত পার্ট রামসুকুল; এখনও ভেবে দেখ।"

দৃঢ়কণ্ঠেই রামসুকুল উত্তর দেয়, "কেবল নারদের অভাবে এমন পালা নষ্ট হবে, তা আমি হতে দেব না লোকুদা। আমি গান গাইতে পারি, রামজীর ভজন আমাদের বাড়ীতে হয়। তুই এক পদ করে নাচটা ও এ কয় মাসে অভ্যেস করে নেব, কিছুতেই বাধবে না তুমি দেখে নিয়ো।"

খুসিতে লোকনাথের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বললে, "নারদ ও পাওয়া গেল, পেতেই হবে, মা তুর্গার কাজ তিনিই করিয়ে নিচ্ছেন—না হলে মুখ দেখানোর উপায় থাকতো না আমাদের। এর মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় রটে গেছে এবার আমরা মানে ছোটরা যাত্রা করব, তাই সকলেই জিজ্ঞাসা করছে। আমার কাকা এককালে খুব ভালো অ্যাক্টর ছিলেন তো, তিনিই আমাদের রিহার্সাল দেওয়ার ভার নিয়েছেন। তবে আর কি—এবার আমাদের অ্যাক্টর ঠিক হয়ে গেল, এখন কোথায় রিহার্সাল দেওয়া যাবে সেই জায়গাটা ঠিক করা যাক—কি বল ?"

জিতেন বললে, "আমি দাতুকে বলেছি, তিনি আমাদের মস্তবড় বৈঠকখানাটা দিতে রাজি আছেন। ওটা একেবারে বাইরের দিকে তো, আমরা নাচি, গাই, চেঁচাই, ভেতর বাড়ীতে কেউ শুনতে পাবে না।"

লোকনাথ বললে, "যাক, জায়গাটাও পাওয়া গেল, এখন হচ্ছে সময় আর দিন ঠিক করা। কাল ভালো দিন আছে,—স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, তবে কাল তুপুরে ভাত খেয়েই সব জিতুদের বৈঠকখানায় আসবে। কেবল কাল নয়, রোজ আসতে হবে। বেলা বারোটা হতে পাঁচটা পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা আমাদের রিহার্সাল হবে, নিশ্চয়ই তাতে কারও অমত হবে না। আমি আজ গিয়ে কাকাকে বলে সব ব্যবস্থা ঠিক করব, দেখো—আমায় যেন বেকুব বনতে না হয়।"

"না না না—"

সবাই সমস্বরে চীৎকার করে।

তাদের থামিয়ে জিতেন বললে, "বেকুব তোমায় হতে হবে না, এরা সবাই ঠিক আসবে। তুমি ঠিক সাড়ে এগারোটায় এসো, কাকাবাবু বারোটায় এলেই চলবে।"

সবাই সম্মতি জানায়।

তিন

অদম্য উৎসাহে রিহার্সাল চলে।

গ্রীষ্মের বন্ধ শেষ হয়ে গেলেও রিহার্সাল চলে সন্ধ্যাবেলায়, অবশ্য সময় খুব কম, বাড়ীতে পড়ার তাড়া আছে নইলে পরদিন স্কুলে শাস্তি পেতে হবে।

স্কুলের ছুটির পর বাড়ী গিয়ে যা হয় জলযোগ করেই ছেলেরা এসে জোটে জিতেনদের বৈঠকখানায়। রিহার্সালের সময় কম, সাড়ে পাঁচটা হতে সাতটা পর্যন্ত—তা দেড় ঘণ্টাই কি কম সময়? ছুটির দিনে যথানিয়মে দুপুরে রিহার্সাল হয়। লোকনাথ শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ী আসে, রবিবার রিহার্সাল হয়, সোমবার সকালে সে কলকাতায় ফেরে।

কলকাতায় যে মেসে সে থাকে, সেখানেই চুপিচুপি রামের পার্ট সে মুখস্থ করতো। পরে সবাই জেনে গেছে লোকনাথ সখ করে যাত্রার দল গড়েছে, সেখানে সে নিচ্ছে রামের পার্ট। বলা বাহুল্য সকলের মধ্যেই উৎসাহ জাগে, বয়োবৃদ্ধেরা লোকনাথের পিঠ চাপড়ান—সাবাস ছেলে বাপু, কলেজের পড়া করেও পার্ট মুখস্থ করছো। বেশ বেশ, পূজোর সময় তো সবারই ছুটি আছে, কোনদিন প্লে হবে আমাদের জানিয়ো, আমরা ঠিক গিয়ে হাজির হব।"

এমন কি মেসের উড়িয়া পাচক জগন্নাথ, এবং হিন্দুস্থানী ভৃত্য গুলুয়া পর্যন্ত হাতযোড় করে অতি গোপনে জানালো—তারাও যাত্রা দেখতে যাবে, ছোটবাবু তাদেরকেও যেন খবর দেন।

মহানাট্যের নায়ক রামজীর কদর যে তাদের কাছে বেড়ে গেল, এ কথা বলাই বাহুল্য। জগন্নাথ তার খাবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলে, তার থালায় মাছের পরিমাণ বেড়ে গেল, গুলুয়া তার আদেশ পালন করতে অত্যন্ত বেশীরকম তৎপরতা দেখাতে লাগলো, যার জন্য লোকনাথ বিলক্ষণ সংকুচিত হয়ে উঠলেও খুশী হয় কম নয়।

গ্রামে এসেও কি নিস্তার আছে?

বড়রা তাকে ডেকে উপদেশ দেন—"দেখো বাপু, যেন মুখ রাখতে পারো। কেদার অপেরা শুনছি তলে তলে তোমাদের ডাউন করবার সুযোগ খুঁজছে। ওরা আমাদের বিপক্ষ দল তো, বরাবর আমরা যখনই যাত্রা-গান করেছি, ওরা আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওদের দল নিয়ে পরের দিনই নেমেছে আসরে। এবার আর সরাসরি পাল্লা দিতে নামেনি কারণ তোমরা ছোটরা পূজো আর যাত্রার ভার নিয়েছো কিনা, তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ওরা বোধহয় লজ্জা পায়। যাই হোক বাপু, খুব সাবধান হয়ে নেমো—যেন মুখ হাসিয়ো না। তোমরা আমাদের আশা ভরসা, আমাদের দেশের গৌরব, সে গৌরব যেন বজায় থাকে।"

স্মিতহাসি হাসে লোকনাথ, বলে, "কোন ভয় নেই। ছেলেদের যা রিহার্সাল চলছে, একদিন গিয়ে বরং দেখবেন। আমাদের মুখ রাখবে লব কুশ, আর মুখ রাখবে নারদ--"

উপদেশদাতা শশব্যস্তে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই নারদের কথাই বলব ভেবে কথাটা তুলেছিলাম। শুনলাম আমাদের স্কুলের বেহারা রামভজনের ছেলেটা নাকি নারদের পার্ট করছে। খাঁটি হিন্দুস্থানী ওরা, নারদ চরিত্রের বোঝে কি—ও কি ফুটাতে পারবে নারদকে? হয়তো আসরে এসে বাংলা বলতে গিয়ে হাম হ্যায় তুম হ্যায় করতে আরম্ভ করবে, শেষ পর্যন্ত শ্রোতারা হাততালি দেবে, টিটকিরী করবে।"

লোকনাথ মাথা নাড়ে, "না না, এ আপনাদের মিথ্যে ভাবনা। রামসুকুল একেবারে খাঁটি বাঙালী হয়ে গেছে, এই স্কুলেই তো ক্লাস নাইনে পড়ে, বাংলায় সে সবচেয়ে ভালো নম্বর রেখেছে। চেহারাটাও বেশ লম্বা চওড়া, নারদের লম্বা পাকা

চুল আর গোঁফ দাড়িতে তাকে বেশ দেখাবে দেখবেন। বাংলা সে বেশ জানে, গান গাইতে পারে, মাঝে মাঝে নাচের পোজও দেখাতে পারে। আসবেন আমাদের ড্রেস রিহার্সালের দিনে, দেখবেন সে কি চমৎকার করে।"

সবচেয়ে খুশী হন জিতেনের বৃদ্ধ দাদু, এবারকার দুর্গোৎসবের প্রেসিডেণ্ট যাদবেন্দ্র বোস।

এক একদিন তিনি রিহার্সাল-রুমে এসে বসেন—রিহার্সাল শুনে তাঁর কুতকুতে চোখ দুইটি আরও বেশী কুতকুত করে, দন্তহীন মুখে হাসি আর ধরে না। কতদিন কত অভিনেতার পিঠ চাপড়েছেন, মহোল্লাসে হাততালি দিয়েছেন। লোকনাথের কাকাবাবু—যিনি যাত্রার বিশেষ ভার নিয়েছেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "এসব ছেলে হীরের টুকরো মেঘনাদ, বেঁচে থাকলে এরা যে কত বড় হবে সে ধারণাই আমি করতে পারি নে। দেখবেন একদিন এরা হবে শিশির ভাতুড়ি, অহীন চৌধুরী, দুর্গাদাসের সমান—চাই কি তাদের ছাড়িয়েও এরা উঠতে পারে। সেদিন আমি থাকব না, তোমরা সবাই সেদিন দেখতে পাবে আমার আশীর্বাদ সত্য হয়েছে।"

বেচারা যাদবেন্দ্র বোস, জানেন না আজকাল এসেছে সিনেমার যুগ, এ যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, উত্তম, বিশ্বজিত, সৌমিত্র প্রভৃতি। ছবির পরদা হতে তাঁরা মানুষের মনের পরদায় প্রতিফলিত হয়েছেন। যাত্রা এখন আসর জমাতে পারে না, থিয়েটারের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ—

এখন সিনেমার যুগ—ছেলেমেয়েরা এখন আসরে বা ষ্টেজের চেয়ে পরদায় ফুটে উঠতে বিশেষ উৎসুক।

চার

এসে পড়েছে দুর্গাপূজা—

প্রতিপদ হতে আরম্ভ হয়েছে পূজার আয়োজন, তার চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা যাচ্ছে যাত্রার প্রস্তুতিতে। স্কুলের ছুটি না হতেই ছেলেরা স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ করেছে।

সারা গ্রামে হৈ হৈ কাণ্ড,—অন্যবারে বয়োজ্যেষ্ঠরা অভিনয় করেন, এবার করছে কয়োকনিষ্ঠেরা,—উৎসাহ উদ্যম তাদের বড়দের চেয়ে অনেক বেশী।

দিনে রাতে সবাই প্রাণপণে পার্ট মুখস্থ করছে। এর মধ্যে কসরত বেশী নারদের, সে বেচারা দিনরাত ঘরের মধ্যে একতারা বাজিয়ে গান গাইছে—

হরিনাম কর রসনা—

এই সুধামাখা নামটি নিতে যেন ভুলো না।

সঙ্গে সঙ্গে নাচের কসরত চলছে।

রামভজনের বুক অহংকারে ভরে উঠেছে, পথে ঘাটে, বাজারে মাঠে যারই সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই শুনিয়ে দিচ্ছে তার রামস্কুল বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে যাত্রাগান করছে।

ষষ্ঠীর দিন বৈকালে লরীতে করে প্রতিমা এসে পৌঁছালো।

বাধ্য হয়ে পূজার ব্যবস্থা করার ভার নিতে হয়েছে মোহনলালের বাবাকে; যাত্রার রিহার্সালের আতিশয্যে পূজা না পণ্ড হয়, বয়োজ্যেষ্ঠগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। ছোট ছেলে মেয়েদের বড় উৎসাহ, প্রতিমা আসার সময় হতে তারা পূজামণ্ডপ জাঁকিয়ে বসেছে।

প্রতিমা দেখবার পর্য্যন্ত অবকাশ হয় না যাত্রার জন্য, ছেলেরা সবাই দিনরাত রিহার্সাল দিচ্ছে। লোকনাথ বারবার সতর্ক করছে—দেখো, খুব সাবধান, এতদূর এগিয়ে যেন সব পণ্ড না হয়।"

সপ্তমীর দিন সকালে স্নানান্তে এসে তারা সবাই প্রণাম করে গেছে, সারাদিন রাত্রি তাদের পূজামণ্ডপে আর দেখা যায় নি।

অষ্টমীর দিনে গ্রামে হৈ হৈ ব্যাপার।

আরতি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হল। লোকনাথ ঘড়ি ধরে সময় নির্দিষ্ট করে ঘোষণা করেছে—ঠিক রাত আটটায় কনসার্ট বাজবে, বৈকাল হতে সকলের গ্রীণরুমে উপস্থিত হওয়া চাই।

হাঁফ ছাড়বার সেদিন অবকাশ নাই।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসর লোকে ভরে গেছে, অতবড় মাঠটায় জায়গা ধরে না। কেবল এ গ্রামের নয়, আশপাশ গ্রামেরও আবালবৃদ্ধ বণিতা "লব-কুশের যুদ্ধবিজয়" অভিনয় দেখতে এসেছে।

কৌতূহল হওয়ারই কথা। এতকাল বয়োজ্যেষ্ঠরাই অভিনয় করতেন; এবার তাঁরা ভার ছেড়ে দিয়েছেন ছোটদের উপরে। এ দলে নয় দশ বৎসরের ছেলে হতে আরম্ভ করে আঠারো কুড়ি বৎসরের ছেলেরা সবাই অভিনয় করবে—এরজন্য কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক।

ঢং ঢং করে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হয়ে গেল।

গ্রীণরুমে তখন মহা হৈ হৈ ব্যাপার চলছে। কলকাতার মেস হতে এসেছেন অমূল্য পাঠক, সনাতন সেন প্রভৃতি। তাঁরা নাকি খ্যাতনামা ড্রেসার,—উপযুক্ত সাজ-সজ্জার ভার তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

লোকনাথের কাকা মেঘনাদের গলঘর্ম অবস্থা দেখে সনাতন সেন তাঁকে সাহায্য করেন।

রামের বেশে লোকনাথকে দেখাচ্ছে চমৎকার। মা কৌশল্যা তার চেয়ে বিঘতখানেক বড়, তা হোক, মায়েরা বড়ই হয়ে থাকেন,—নাই বা ছোট হলেন।

কনসার্ট থেমে যেতেই আসরে বীরদর্পে রাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্ন প্রবেশ করলেন।

রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন; যজ্ঞাশ্ব ছেড়ে দেওয়া হবে, লক্ষ্মণ সসৈন্যে অশ্বের পিছনে পিছনে যাবেন। অশ্ব নিজের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবে, লক্ষ্মণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, কেউ অশ্ব আটক করলে যুদ্ধ করবেন। রামের অভিনয় সুন্দর হয়েছিল, দর্শকেরা বার বার হাততালি দিলে যাতে রামের বুক দশহাত হয়ে উঠলো।

এরই মধ্যে ঘুমুর পায়ে একতারা বাজিয়ে হরিনাম গাইতে গাইতে নাচের ছন্দে পা ফেলে আসরে নারদ প্রবেশ করলে।

"আরে হামার রামসুকুল রে, আরে কত্তা বড়িয়া হুয়া থা—রে—"

রামভজনের উৎকট আনন্দধ্বনি, শোনা যায়, সঙ্গে সঙ্গে রামসুকুলের ভাই-

বোনদের উচ্ছল কলকোলাহলে থেমে যায় বেচারা রামসুকুল, লম্বা সাদা গোঁফের খানিকটা তার মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ে ;—ডান হাতে একতারাটা ধরে বাঁ হাতে লম্বা দাড়ি গোঁফ চেপে ধরে ঘুমুর বাজিয়ে রামসুকুল দ্রুত গ্রীণরুমে ঢুকে গেল। লোকে হৈ হৈ করে।

এরপর দেখা যায় বাল্মীকির তপোবনে লবকুশসহ সীতাকে, লব-কুশ যজ্ঞাশ্ব ধরেছে, মায়ের কাছে তারই গল্প করছে। এ দৃশ্যটিও প্রশংসা লাভ করলে।

লব-কুশের দারুণ বীরত্বে ঘনঘন হাততালি পড়ে,—লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সবাইকে তারা বন্দী করে মায়ের চরণ বন্দনা করে। যুদ্ধে আসেন স্বয়ং রামচন্দ্র।

পিতা পুত্রে সে কি নিদারুণ যুদ্ধ। রামের কোমরের বেল্ট খসে পড়ে আর কি, মহাবীর রাম বামহাতে প্যাণ্টসুদ্ধ বেল্ট চেপে ধরে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শেষে রামও মূর্চ্ছা যান,—পরাজয় ঘটে তাঁর পুত্রদের হাতে।

এরপরই আবার নারদের আবির্ভাব—

একতারা বাজিয়ে আবার তার নাচের ভঙ্গিতে প্রবেশ, অনেকগুলি উপদেশ সে দিলে তারপর।

"আরে—আরে, আমাদের রামসুকুল রে—রামসুকুল নারদ সেজেছে দেখ—"

স্কুলের ছেলেরা এতক্ষণে রামসুকুলকে চিনতে পারে, যুগপৎ সবাই চীৎকার করে ওঠে, বিদ্রূপ করে। আর সহ্য হয় না রামসুকুলের,—হাতের একতারা উঁচায় সে। ব্যাপার দেখে মা জানকী তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে যান গ্রীণ-রুমে।

একে একে আসেন সবাই।

মহামুনি বাল্মীকি এসেই কাঁধের গামছাখানা আসন অভাবে পেতে বসে ধ্যানে নিমগ্ন হন। ওদিকে বেচারা রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নকে বহন করে নিয়ে যায় স্কুলের ছেলেরা,—কতক্ষণ তারা আসরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

মাঝামাঝি জায়গায় সীতা যখন "হা রাম" বলে আছড়ে পড়লো, তখন তার মাথার চুল যে খসে পড়লো সে খেয়াল তার ছিল না। আসরে ভীষণ অট্টহাসির

শব্দে সচকিতা সীতা মাথায় কাপড় টানতে গিয়ে যখন কেশহীন মাথার দুরবস্থা বুঝতে পারলো, তখন তার ছুটে না পালানো ছাড়া আর উপায় ছিল না।

এরপর আসরে বীর হনুমানের আবির্ভাব হল।

ভীষণ মুখখানা তার, চার হাত পায়ে ভর দিয়ে পুরা পাঁচ হাত লম্বা লেজটাকে টানতে টানতে বিকট চীৎকার করে সে যখন আসরের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লো, তখনই আরম্ভ হল হুলুস্থুল কাণ্ড।

ছোট ছেলেমেয়েরা চীৎকার করে ছুটে পালাতে চায়। অনেকে পালাতে গিয়ে অন্যের ঘাড়ে পড়ে, সমস্ত আসর একেবারে গরম হয়ে ওঠে।

"বার করে দাও, বীর হনুমানকে চলে যেতে বল—" আসরের বয়োজ্যেষ্ঠরা ছোটদের সামলাতে সামলাতে চীৎকার করেন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, হনুমান আসরে লম্ফঝম্প আরম্ভ করে দিলে। ওদিকে জনসমুদ্রে যে ঝগড়া, ঠেলাঠেলি, অবশেষে মারামারি সুরু হয়ে গেছে, নিজের কৃতিত্বে আত্মহারা হনুমানের কানে সে গোলমাল পৌঁছায় নি, মুখোস ঢাকা চোখের দৃষ্টি ও সেই ঠেলাঠেলির উপর পড়ে নি।

পিঠের উপর দমাদম ইট এসে পড়তে অকস্মাৎ তার চেতনা ফিরে এলো, মুহূর্ত সে চুপ করে থেকে অবস্থাটা প্রনিধান করলে, তারপর—তারপর চার পা যুক্ত হনুমান সোজা হয়ে দুই পায়ে দৌড়ে পালালো গ্রীণরুমে নয়—বরাবর পাশের বাগান ভেঙ্গে সোজা নিজেদের বাড়ীর দিকে।

দেখা গেল বৃদ্ধ যাদবেন্দ্র বোস রীতিমত খোঁড়াচ্ছেন, তাকে দুজন ধরে নিয়ে চলেছে। এদিক ওদিকে ভীষণ মারামারি আরম্ভ হয়ে গেছে—এরই মধ্যে জনকয়েক দুষ্ট লোক আলোর চিমনিতে ইট মেরে ভেঙ্গে দিতে মুহূর্ত মধ্যে সব অন্ধকার হয়ে গেল।—

বাবা রে, মারে, গেলাম রে—

চীৎকার শব্দ শোনা যায়,—এ যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার। গ্রীণরুম ততক্ষণ খালি হয়ে গেছে, রাম লক্ষ্মণ সীতা কৌশল্যা, বাল্মীকি নারদ প্রভৃতি যারা গ্রীণরুমে ছিল, তারা সবাই পালিয়েছে।

—শুধু লব-কুশ রূপী দুটি অবোধ বালক গ্রীণরুমের বাইরে চীৎকার করে কাঁদছে

এর পরের কথা আর না বললেও চলে।

নিদারুণ লজ্জায় ভোরের ট্রেণে লোকনাথ শান্তিপুরে বোনের বাড়ী চলে গেছে।

ছেলেরা এরপর হপ্তাখানেক বাড়ী হতে বার হয়নি। বৃদ্ধ যাদবেন্দ্র বসুকে পূরা তিনটি মাস বিছানায় শুয়ে পড়ে পায়ে বাতের তেল মালিশ করতে হয়েছিল।

বাহাদুর

এক

অনেককাল পরে প্রকাশ গ্রামে ফিরলো।

দীর্ঘ আট-নয় বৎসর আগে হঠাৎ একদিন সে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সংসারে এক মামা-মামী ছাড়া আর কেউ ছিল না,—মামার সংসারে ভূতের মত খাটতো—হাট বাজার দোকান সবই সে করতো—তারপর ছিল স্কুলে যাওয়া, পড়াশুনা করা।

মামী মোটেই তাকে পছন্দ করতেন না, মামাও নির্য্যাতন করতেন বড় কম নয়। ফ্রিতে স্কুলে সে পড়তো, আমরা সবাই চাঁদা করে তার বই খাতাপত্র দিতাম।

সেই প্রকাশ সপ্তম শ্রেণীতে ফেল করে রেজাল্ট নিয়ে আর মামার বাড়ী ফিরলো না, কোথায় সে চলে গেল কেউ খবর রাখে না। সেইদিনই সন্ধ্যায় নদীর ধারে পরমেশের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, তাকেই জানিয়েছিল চিরকালের মতই সে গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে। এ গ্রামের লোক কেউ তাকে চিনলে না, সেইজন্যই সে গ্রামে থাকবে না।

চিনলে না মানে— ?

পরমেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশকে না চেনে এমন লোক এ গ্রামে কেন, আশপাশ গ্রামে নাই। মিথ্যাকথায় সে ওস্তাদ, দুষ্টামী বুদ্ধিতে সে পরিপক্ক। বাল্যে পিতামাতা হারিয়ে সত্যই সে অত্যন্ত চালাক-চতুর হয়ে উঠেছিল। এককথায় সে ছিল অদ্ভুত, তার জুড়ি মেলা ভার।

পড়াশুনায় ভালো নয়, তবু এ গ্রাম ছেড়ে সে কোথাও যায়নি, বাইরের জগৎ তার কাছে একেবারেই অপরিচিত, ফেল করার লজ্জা মুছতে সেই বাইরের জগতে সে বার হয়ে পড়লো।

এরপর মাঝে মাঝে উড়ো খবর পেতাম সে নাকি এখন পরম সাধু ব্রহ্মানন্দ গিরির প্রধান শিষ্যরূপে হিমালয়ের কোন এক গহ্বরে তপস্যা করছে। কেউ বলতো —জলন্ধরে থেকে সে এখন ব্যবসা করে মস্ত বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করছে, কেউ বলতো—সে বিলেত চলে গেছে উড়োজাহাজে কাজ নিয়ে।

সেদিন কলেজ হতে ফিরবার সময় হেদোর ধারে হঠাৎ যেন প্রকাশের মত একটি ছেলেকে দেখতে পেলাম, মোটরে উঠছে। মুখখানা প্রকাশের মত হলেও সে প্রকাশ নয়। দামী স্যুট পরা, চোখে গগল্‌স, মোটরে উঠছে,—আট-নয় বৎসরের মধ্যে প্রকাশের এতখানি পরিবর্তন একেবারেই অসম্ভব।

আমার বিস্মিত চোখের সম্মুখ দিয়ে ক্যাডিলাক গাড়ীখানা প্রকাশকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সাঁ করে।

এরই তিনদিন পরে গ্রামে হল প্রকাশের শুভাগমন।

সে এক হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার।

চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল—প্রকাশ এসেছে।

বি, এ, একজামিন দিয়ে বাড়ী এসেছি, ফল জানলে এম, এ ক্লাসে ভর্তি হব, বর্তমানে কোন কাজ নাই।

প্রকাশ ফিরেছে কথাটা কানে আসতে মনে পড়ল স্কটিশচার্চ কলেজের পাশে বিডন ষ্ট্রীটে প্রকাশকে মোটরে উঠতে দেখেছিলাম।

জানিনে—সেদিন সে আমায় লক্ষ্য করেছে কিনা। নিশ্চয়ই চিনতে পারেনি, ক্লাস সেভেনের বালক আমির সঙ্গে বর্তমান আমির আকৃতি প্রকৃতির অনেক পার্থক্য ঘটেছে।

যাই হোক প্রকাশ যে মানুষ হয়েছে তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। তবু এ গ্রামকে সে ভুলতে পারেনি, একবার অন্ততঃপক্ষে দেখতেও এসেছে।

পরিমল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিলে, "জানো অমি, প্রকাশকে দেখে আর চেনা যায় না, একেবারে বদলে গেছে। লম্বা চওড়া, ইয়া মোটাসোটা—ফর্সাও হয়েছে বেশ, তারপর দামী সাহেবী পোষাক, উঃ, কি করেই যে কপালটা ফিরলো তার—তাই ভাবছি।"

বললাম, "কথাবার্তা হয়েছে কিছু— ?"

হতাশ ভাবে পরিমল বললে, "কাছেই যেতে পারলাম না—কথাবার্তা হবে কি ? মামা-মামীর কাছে আজ তার খাতির কত। গাঁয়ের লোক যারা তাকে একদিন "বাউণ্ডুলে, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী" বলেছে, আজ তারাই তাকে ঘিরে রেখেছে। একদিন যারা তাকে "লোফার" বলে ডেকেছে, আজ তাদের কাছে তার কদর দেখ গিয়ে।"

সেই প্রকাশ—যে শীষ দিয়ে পথে হাঁটতো, বয়োজ্যেষ্ঠের মুখের উপর অনায়াসে নিজের মত ব্যক্ত করতো, গলা ছেড়ে ঘাটে বসে সিনেমার গান গাইতো, আর কেউ কিছু বলতে এলে তাল ঠুকতো। যাকে সে দেখতে পারতো না তাকে যে কোন রকমে অপমান করে তার শান্তি হতো।

সেই প্রকাশ—আজ তার খাতির কত ?

দুই

একদিনকার কথা—সেবার আমরা ক্লাস সেভেনে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

পরমেশের বিবাহ—আমাদের পরমেশদা—প্রকাশের মামীমার ভাইপো, বিবাহ হবে অনেক দূরে—কেঁড়াগাছি গ্রামে।

ট্রেন হতে নেমে সাবেক যান গরুরগাড়ী করে কাঁচা রাস্তা ভেঙ্গে পাঁচখানি গাড়ী বোঝাই বরযাত্রী আমরা কেঁড়াগাছি পৌঁছালাম বেলা তিনটায়। তখন এ গ্রাম পাকিস্থানের অন্তর্গত হয়নি,—হিন্দুস্থান পাকিস্থানের জিগীর উঠেছে মাত্র।

কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ীতে প্যাক হয়ে যাঁরা দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা জানেন এ গাড়ীতে যাতায়াত কত সুখের। কারও মাথায় ঠোকা লেগে ফুলে ওঠে, কারও পা মচ্‌কে যায়, কে কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। কেবল ছেলেদের এ গাড়ীই নয়, সব গাড়ীতে সমান অবস্থা।

অবশ্য কেঁড়াগাছি পৌঁছে প্রচুর আদর আপ্যায়ণে আমাদের সে ক্ষোভ আর রইলো না। পাত্রের গাড়ী ছাড়া আর চারখানি গাড়ীতে আমরা ছিলাম চব্বিশজন বরযাত্রী, সংখ্যায় ছিলাম বেশ।

আমাদের মধ্যে একজন ছিল প্রকাশ। আসর জমাতে তার মত ছেলে বড়দের মধ্যেও ছিল না, সে জন্য তাকেই সাগ্রহে সকলে চাইতো। সত্য মিথ্যা জড়িয়ে সে এমন আজগুবি গল্প ফাঁদতো; এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করতো যাতে শ্রোতারা কখনও হাসতেন, কখনও কাঁদতেন, কখনও বিস্ময়ে কখনও ভয়ে অভিভূত হতেন।

আমরা জানতাম তার গল্পে মিথ্যা আছে পনের আনা, তবু তার বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

প্রকাশের মামীমার ভাইপো পরমেশের বিবাহ, প্রকাশ তো আসবেই। সমস্ত আসরটিকে সে একাই জমাট করে রাখলো; সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

বিবাহের পর খাওয়া দাওয়ার পালা মিটে গেলে এলো শয়নের পর্ব।

মস্ত বড় একটা ঘরে ঢালা বিছানায় বরযাত্রীদের শয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা তো বটেই, বিশ্ব নিন্দুক সুখময় দত্ত পর্যন্ত স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, এ বয়সে

পাঁচশো বিয়েতে বরযাত্রী গেছি, কিন্তু এমন সুব্যবস্থা কোথাও চোখে পড়েনি, এ কথা হাজার বার বলব।"

আরাম করে শুয়ে পড়লাম সবাই,—অবশ্য বয়োবৃদ্ধেরা একদিকে, আমরা একপাশে।

প্রথম দু পাঁচ মিনিট সবাই তোফা ঘুমালাম কিন্তু তারপর ?

চট করে ঘুম ভাঙ্গলো কেবল আমারই নয়—সবারই।

সারা গায়ে কি যে কামড়ায়, যেন সূচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চুলকোনি আর ফুলে ওঠা।

মশা—

এমন বড় বড় মশা আমরা জীবনে কোনদিন দেখিনি। গরমকাল, দিব্য হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে সবাই শুয়েছি, ঘুম আসতে না আসতে মাসি পিসীর দল গুণগুণিয়ে গান গেয়ে আমাদের ঘুম পাড়াতে এসেছে, আমরা সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

নরেন, মধু, পেলব, এমন কি বৃদ্ধ সুখময় দত্ত, মনোহর ভশ্চার্যি সবাই ঘরের বাইরে, সবাই মিলে গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করছেন—যদি ও কোন ফল হচ্ছে না।

গরম রক্ত আমাদের এ অত্যাচারের প্রতিকার আমরা নিশ্চয়ই চাই তাই বিয়ে বাড়ীর উঠানে গিয়ে সমস্বরে চেঁচাই—"মশাই, গোটাকত মশারী দয়া করে পাঠিয়ে দিন, আমাদের প্রাণ যাওয়ার যোগাড় হয়েছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে,—বিবাহ বাড়ী তখন নিস্তব্ধ, এত চেঁচানোতেও কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অনেকেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, যারা জেগে আছে তারাও সাড়া দিলে না।

পাখা দিয়ে বাতাস করলে ও এ মশা যায় না, ঝাঁকে ঝাঁকে জলা ও কচুবনের মশা সামনে পেছনে, আশে পাশে, দল বেঁধে আক্রমণ করে।

দেশ বিদেশে বেড়িয়ে অনেক মশা দেখেছি, অনেক মশার কামড় ও সহ্য করেছি,

মৌমাছির মত এত বড় আর এমন ঝাঁক ঝাঁক মশা কখনও দেখিনি এমন জ্বালাও সইনি।

ঠিক এমনই সময় মুক্তকচ্ছ ও গাড়ু হাতে বাইরে হতে ফিরছিলেন পাত্রীর জ্যেঠামশাই, বেপরোয়া প্রকাশ রুখে উঠে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, রুক্ষকণ্ঠে বললে, "কি মশাই, শুধু খাইয়ে দাইয়েই কাজ ফতে করলেন বুঝি? আপনাদের চোখে চামড়া আছে কি? এতগুলো বরযাত্রী আমরা, রীতিমত ভদ্রলোক, এখানে এসেছি কি প্রাণ হারাতে?"

বৃদ্ধ একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন, বিকৃত মুখে বললেন, "প্রাণ যদি তেমন সস্তা হয়—হারাবেন, আমার কোন আপত্তি নেই তাতে। ইচ্ছে হয় শুয়ে থাকুন, না ইচ্ছে হয় পায়চারি করুন, সোজা চলে যান—।

মেয়ে তাঁদের পার হয়ে গেছে, অনুনয়ের সুর কণ্ঠে আর নাই, করযোড় করা তো অনেক পরের কথা।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মশাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, "মাটি বড় শক্ত হে, তোমার আঁচড়ে দাগ বসবে না।"

প্রকাশ রূঢ়কণ্ঠে বললে, "বসে কিনা দেখছি। দাগ বসা দূরে থাক, বেড়ালকে চার পা দিয়ে পুকুর খুঁড়তে হবে আপনারা দেখে নেবেন।"

ঘুমে চোখ বুজে আসে, মশার ব্যাণ্ড বাজনা শুনি, চটাস চড় মেরে এক ঘায়ে দশ বারোটা মশা মারার সঙ্গে শরীরে জ্বালা সহ্য করি, আর বসে বসে ঢুলি।

প্রকাশ ভিতর বাড়ীতে ঢুকে যায়, একটু পরেই দেখি মেয়ের দাদাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। আমাদের দেখিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বললে, "বিশ্বাস না হয়—আপনারা নিজের চোখে দেখুন এঁদের অবস্থা। কোন ভদ্রলোক এরকম অবস্থায় ঘুমুতে পারে মশাই, আপনিই বলুন। তারপর এঁদের মধ্যে যাঁরা ভোরবেলা রওনা হয়ে কাল সোমবারে অফিস করতে যাবেন, তাঁরা ওই ফোলা মুখ দেখাবেন কি করে, সেকথাটা ভেবেছেন একবার? এত সকাতর প্রার্থনা করছি, আপনারা একটিবার

কান দিয়ে না হয় গোটা তুই বড় মশারী আমাদের দিন, আমরা তার মধ্যেই না হয় বসে বসেই রাত কাটাব।"

মেয়ের দাদা মাথা চুলকান, "তাই তো মশাই, মশারীই যে এখানে তুষ্প্রাপ্য। অজ পাড়াগাঁ, এ তো সহর বাজার নয় যে অর্দ্ধেক রাত্রে টাকা দিলে সবকিছু মিলবে,—এখানে মশাই কিছু পাবেন না। এর নাম কেঁড়াগাছি গাঁ, এখানে কিছু নেই মশাই। যাক, আর বেশী রাত নেই, দেড়টা বেজেছে, গরমের রাত—চারটেয় ফরসা হয়ে যাবে। আর এইটুকু সময় বসে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিন।"

তিনি চলে যান।

করুণ সুরে মনোরঞ্জন মামা বললেন, "যেতে দাও প্রকাশ, এ কয়ঘণ্টা এমনি করে বসে বেড়িয়েই আমরা কাটাই, আর ছোটোলোকমী করে দরকার নেই।"

প্রকাশ মাথা নিচু করে শুধু গোঁ গোঁ করে—ডেলাইটের উজ্জ্বল আলোটা নিষ্প্রভ হয়ে আসে, প্রকাশ পাম্প করতে বসে।

তিন

আমরা বসে বসে ঝিমাচ্ছি। মাঝে মাঝে ভশচায মশায়ের করুণ আর্তনাদ কানে আসছে—"তারা ব্রহ্মময়ী, আর কত জ্বালা দিবি মা, পার কর মা পার কর।"

কতক্ষণ পরে জানিনে, কার আর্ত চীৎকারে আমরা সবাই সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াই—কে চেঁচাচ্ছে—"ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ গাঁয়ের লোকেরা, ছুটে এসো, আমায় বাঁচাও, আমি গেলাম, আমায় এরা খুন করলে, আমার সব রক্ত চুষে খেলে।"

এ কে, কে এই গভীর রাতে এমন চীৎকার করে?

পরস্পর পরস্পরের পানে তাকাই, গায়ে হাজার গণ্ডা মশা বসলো, তাদের মারবার কথা মনে জাগে না।

হঠাৎ ফণীভূষণ চেঁচিয়ে উঠলো, "এ কি, আমাদের প্রকাশ,—প্রকাশ গেল কোথায় ?"

আমরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, এ প্রকাশেরই কণ্ঠস্বর, প্রকাশ বিপদে পড়ে সাহায্য চেয়ে চীৎকার করছে।

আমরা একেবারে আড়ষ্ট।

এ এই বাড়ীর লোকদের কাণ্ড। বেপরোয়া প্রকাশ তাদের অপমানকর অনেক কথা বলেছে, মেয়ের দাদার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছে, তারাই আমাদের তন্দ্রার অবকাশে আমাদের সঙ্গী প্রকাশকে টেনে নিয়ে গেছে, হয়তো অশেষ নির্য্যাতন করে খুন করবে।

নাঃ, আর বিলম্ব নয়—

আমরা সবাই বার হয়ে পড়লাম। এস্পার কি ওস্পার, প্রকাশের জন্যে আজ দরকার হলে এ বাড়ীর সবাইকে খুন করে ফেলব, আমরা ফাঁসি যাব— সেও বি আচ্ছা।

ডেলাইট নিভে গেছে, আমরা লণ্ঠন নিয়ে বার হয়েছি।

"প্রকাশ—প্রকাশ রে,—কোথায় তুই—"

ডাকতে ডাকতে বনবাদাড় ভেঙ্গে আমরা ছুটছি। গ্রামের লোক লণ্ঠন ও লাঠি হাতে ছুটে আসছে, এমন কি পরমেশ পর্যন্ত বাসর ছেড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছে।

জোরালো পাঁচ সাতটা টর্চের আলো ফেলে শাখা প্রশাখা সমাচ্ছন্ন যে গাছটার উপর হতে চীৎকার শোনা যাচ্ছিল, তারই একটা ডালের উপর প্রকাশকে দেখা গেল।

"প্রকাশ—প্রকাশ—"

করুণ কান্নাভরা কণ্ঠের উত্তর আসে, "এসেছিস তোরা—উঃ, আমি মরে গেলাম, আমার সব রক্তটুকু চুষে খেয়ে আমায় শাকচুন্নি ভূত করলে। আমায় বাঁচা—বাঁচা ভাই—আমার দুর্গতি তোরা দেখ—"

বলতে বলতে প্রকাশের জোর কান্না শোনা যায়।

এই অন্ধকার রাত্রে অজানা দেশে গাছের উপর প্রকাশের মত ছেলে,—কাঁদছে, সাহায্য চাইছে, এ যেন ভৌতিক ব্যাপার।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য গায়ত্রী জপতে জপতে বললেন, "কোন ভয় নেই বাবা আমি গায়ত্রী জপছি, আর কেউ তোমার এতটুকু অনিষ্ট করতে পারবে না। দেখতো, আস্তে আস্তে নামতে পারবে কিনা, না পারলে বনমালি নামিয়ে আনবে।

প্রকাশের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "আমি স্বপ্ন দেখছিনে তো, সত্যি তোমরা এসেছো কি ?"

বনমালি হাঁক পাড়ে, "সত্যি এসেছি। তাকিয়ে দেখ, নিচে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি, ভশ্চায্যি দাদু গায়ত্রী পাঠ করছেন, কোন ভয় নেই, তুই নেমে আয়।"

গাছের নিচে লোক জমেছে বড় কম নয়। আলো হাতে লোকদের দেখে আস্তে আস্তে প্রকাশ নিচে নেমে এলো।

সবাই এগিয়ে গেলাম—"কিরে, গাছে এলি কি করে ?"

একটি মাত্র কথা প্রকাশ বলে—"মশা—" আশ্চর্য হয়ে যাই সবাই—"মশা কি ?"

প্রকাশ কপালের ঘাম মুছে বললে, "হ্যাঁ মশা। একশো নয়, দুশো নয়—কোটি কোটি, অর্বুদ অর্বুদ ; কি উড়ানটাই উড়ালে আমায়, তা তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে না। ঘরে থাকতে অসহ্য হওয়ায় বারাণ্ডায় শুয়েছিলাম। বাড়ীর লোকদের মশারীর কথা বলায় ওঁরা তাড়িয়ে মারতে এলেন, এই রাত্রে অচেনা আমাদের চলে যেতে বললেন। এই কেঁড়াগাছির মশা,—বারাণ্ডায় আমায় একলা পেয়ে কত ঝাঁক যে এসেছিল তা বলতে পারিনে। কি যে হল জানিনে, জ্ঞান হতে দেখলাম আমি উড়ে চলেছি। ভাবলাম পরীতে বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে,—যেন তখন বোবা হয়ে গেলাম। এরা আমায় কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যেতো, রক্ত তো ছার, হাড়, মাংস চামড়া সবই নিঃশেষ করে দিতো। ভয়ে কাঁটা হয়ে গিয়ে এক গাছের ডাল গায়ে ঠেকালো, অন্ধকারে সেইটাকেই চেপে ধরলাম। উঃ, পৈত্রিক প্রাণটা যে ফিরে পেলাম এই ঢের।"

ব্যাপারটা যে স্রেফ গাঁজা তা আমরা বুঝেছি। খুব প্রতিশোধ নিয়েছে প্রকাশ, আমরা হাসব কি কাঁদব তাই ঠিক করতে পারছিলাম না।

কিন্তু কন্যাপক্ষীয়দের মুখ শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে, খুব চুনকালি দিয়েছে আমাদের প্রকাশ—বাহাদুর ছেলে। গ্রামের লোক ছি ছি রবে ধিক্কার দিচ্ছে, চীৎকার করছে কেউ কেউ—"সামান্য মশারী না দিয়ে এঁরা এতগুলি ভদ্রলোককে এমনভাবে নাগাল করলেন, আমাদের গাঁয়ের মুখে চুনকালি লেপলেন?"

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আমরা পদব্রজেই রওনা হওয়ার উদ্যোগ করলাম।

প্রকাশ অনুনয়রত পাত্রীর জ্যেঠা দাদাকে গম্ভীর মুখে বললে, "সহজে আপনাদের ছাড়ছিনে মশাই, সোজা থানায় যাব, তারপর কোর্টে। ড্যামেজ স্যুট নিয়ে আসব মনে রাখবেন।"

চা না খেয়ে—গরুর গাড়ীর প্রতীক্ষা না করে আমরা বরযাত্রীর দল হেঁটে রওনা হলাম।

চার

সেই প্রকাশ—

সে আজ সেদিনকার কিশোর প্রকাশ নয়, আজ সে বলবান সুদীর্ঘ দেহী এবং সম্পদে স্ফীত।

নিতান্ত দয়া করেই সে বৈকালে এলো আমাদের বাড়ী।

সবে তাস খেলার সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিলাম, প্রকাশকে দেখেই সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলে সমস্বরে সবাই তাকে সম্বর্দ্ধনা করলাম।

তার চাল গেছে বদলে, হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে সে ডু ডু ডু বলে নাড়া দেয়।

সমীর তাড়াতাড়ি হাতলভাঙ্গা চেয়ারটা সরিয়ে আনে, কিন্তু প্রকাশ বসলো

না। মিলিটারি কায়দায় দুই পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে সে আমাদের সকলকে দেখে। তারপর একটু হেসে বললে, "বেশ বেশ, তোমরা সব একরকমই আছ, সব ষ্টুডেন্ট লাইফ ভোগ করছো—চমৎকার।"

ললিত একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "কি করব ভাই কোন রকমে ডিগ্রিটা নেওয়ার চেষ্টা করছি। অদৃষ্টে চাকরী করেই তো খেতে হবে, বি, এ, পাস না করলে চাকরী পাব না। আমাদের ভাই যথাপূর্বং তথাপরং, এ ছাড়া আর উপায় কই?"

আমি বললাম, "কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলতো প্রকাশ। রাতারাতি আলাদীনের প্রদীপ পেয়ে গেলে নাকি—ভোল যে একেবারে পালটে ফেলেছো দেখছি। সেদিন কলেজ হতে বেরিয়ে বিডন ষ্ট্রীটে—মানে হেদোর ধারে তোমায় মোটরে উঠতে দেখলাম।"

প্রকাশ ঠোঁট জিভে চুক চুক শব্দ করে, বললে, "সরি, আমি তোমায় দেখে ও চিনতে পারিনি। কিন্তু আমার বড্ড দুঃখ রইলো পৃথিবীর হালচাল বদলালো, কিন্তু তোমরা যে তিমিরে ছিলে সেই তিমিরেই রইলে। এই আমাকেই তোমরা এককালে কি তাচ্ছিল্য করেছো,—তোমরা প্রতি বছর ভালোভাবে পাস করে ক্লাসে উঠতে আর আমি হাতে পায়ে ধরে "কেঁদে কঁকিয়ে" কোন রকমে সেভেন পর্যন্ত উঠেছিলাম। তোমরা আমায় চিনলে না, কিন্তু রাশিয়া আমায় ঠিক চিনে নিলে। ক্রুশ্চেভ, গ্যাগারিণ, টিটভ, সবাই আমায় কি খাতিরই না করলে, ওদের সঙ্গে ডিনার পর্যন্ত করলাম। তাই তো বলি—"গেঁয়ো যুগি ভিখ পায় না কথাটা ঠিক, দেশের লোক হীরে চেনে না, কাঁচ চেনে।"

ক্রুশ্চেভ, গ্যাগারিণ, টিটভ—

ভারত ছাড়িয়ে একদম রাশিয়া—যে রাশিয়া আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—বলে কি প্রকাশ?

আমরা সবাই তাকে ঘিরে ধরলাম—"বসো-বসো, তোমার মুখে দেশ বিদেশের গল্প শুনি; আমাদের অদৃষ্টে তো যাওয়া নেই অতএব গল্প শোনাই সার।

সুকুমার চোখ টিপে বললে—"ক্রুশ্চেভ তো কলকাতায় এসেছিলেন,—উঃ, সে কি ধূমধাম, কি জাঁকজমক। উৎসবই দেখলাম, মানুষটাকে দেখতে পেলাম না, তাই দুঃখ রইলো।

মুখ মচকে হাসে প্রকাশ, বললে, "এখানে আর কতটুকুই বা দেখতে পেতে। যেতে পারতে রাশ্যায়,—দেখতে সত্যি তিনি কি মানুষ, তাঁকে দেবতা বলাই চলে। আমি গিয়ে পড়লাম তাঁর কাছে,—সত্যি বলব কি—যেমন তিনি তেমনি তাঁর পরিবার, মানে মিসেস ক্রুশ্চেভ—তেমনি তাঁর ছেলে মেয়ে বউ নাতি নাতনী,—কেউ আমায় ছাড়তে চায় না। নাতি নাতনীগুলো তো আমায় পেয়ে বসলো, খালি ইণ্ডিয়ার গল্প বলতে হবে। এমনকি তাদের খাওয়ার সময় আমায় তাদের টেবিলে বসতেই হবে। ক্রুশ্চেভ গিন্নি তখন আমার হাতেই তাদের ভার ছেড়ে দিলেন, ক্রুশ্চেভ ভারি খুসি।"

মনীশ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "জহুরীই জহর চেনে। দেশের কেউ প্রকাশকে চিনতে পারলে না। আমি সেদিন বললাম না তোমাদের—রাশিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা প্রাভদা একজন করিৎকর্মা বাঙ্গালীর খুব প্রশংসা করে লিখেছে, সে তাহলে তুমিই ?

প্রকাশ গর্বিত হাসি হাসে—উদাসভাবে বললে, "আবার কে হতে পারে ? আশ্চর্য শোন, ওই যে গ্যাগারিণ আকাশে উড়লো, তার রকেট চালালাম আমি, অথচ আমার নাম ওরা কাগজে ছাপলো না। ওর ফটো প্রকাশ হল, সারাপৃথিবীতে জয় জয়কার পড়ে গেল, অথচ আমি যে তার পাশেই ছিলাম, আমার নাম গন্ধ রইলো না। বিশেষ করে সেই জন্যেই চলে এলাম আমি, টিটভ এত বললে—হাত চেপে ধরলে, তবু তার কথা রাখিনি। যেই এসেছি, অমনি ওরা জেনেছে, কাল এখানে গভর্ণরের কাছে তার এসেছে আমায় যেন এখনই রাশ্যায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যাব না বলেই আমি এখানে লুকিয়ে চলে এসেছি। জানি এ খবর গোপন থাকবে না, খবর গেল বলে আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিস আসবে আমায় দমদমে নিয়ে যেতে।"

একবার সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলায় প্রকাশ।

ললিত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে—ঠিক কথা, তোমার মত লোককে রাশিয়া হারাতে পারে না। আমাদের পশ্চিম বাংলার অনেক সৌভাগ্য—প্রকাশের মত ছেলে এখানে জন্মেছে। জানি—একদিন প্রকাশ আমাদের দেশকে সকল দেশের শীর্ষে স্থান দেবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "দুদিন থাকবে তো প্রকাশ?"

সে উত্তর দিলে, "দেখি, কতদূর কি হয়?"

পরদিন সকালে প্রকাশের আসার কথা ছিল, সে এলো না।

খবর পেলাম চারজন কনেষ্টবল সহ একজন এস, আই, এসেছিলেন। মামার বাড়ীর লোকজনদের সব জাগিয়ে সেই শেষ রাত্রে প্রকাশকে ডেকে তুলেছেন। জিপ নিয়ে এসেছেন তাঁরা, এখনই তাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন।

দাঁড়ালাম পথের ধারে—

দেখলাম খবরটা ইতিমধ্যে গাঁয়ের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। জিপ যাওয়ার পথের ধারে অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছে।

আলোচনা করি ললিতের সঙ্গে, কথাটা তা হলে মিথ্যে নয়, প্রকাশ যা বলেছে সবই ঠিক। প্রকাশকে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট আবার রাশিয়াতেই পাঠাবেন, হয়তো আজই তাকে এরোড্রামে নিয়ে যাবে ওরা।

গত কাল সন্ধ্যায় তার গল্প শুনে আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি, আট দশ বৎসর আগেকার কেঁড়াগাছি গ্রামের ঘটনার কথা সবারই মনে হয়েছিল। "হয়কে নয়" এবং "নয়কে হয়" করতে প্রকাশের মত ওস্তাদ ছেলে আর যে কাউকে দেখেছি তা মনে হয় না।

জিপখানা আস্তে আস্তে আসছে কেঁড়াগাছির উঁচু নিচু এবং অপরিসর কাঁচা রাস্তা ধরে, জোরে চালাবার উপায় নাই। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল এস, আইয়ের পাশে বসে প্রকাশ।

আমাদের দেখেই তার মুখখানা দৃপ্ত হয়ে উঠলো, মুখখানা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে

বললে, "চললাম ভাই, কাল যা বলেছিলাম, আজ হাতে হাতে তাই ফললো। যদি কোনদিন সময় পাই, আবার তোমাদের কাছে এই গাঁয়ে ফিরে আসব।"

এস, আই, একবার আমাদের দিকে তাকালেন।

জিপ চলে গেল।

সেই প্রকাশ—

সে আর গ্রামে ফিরলো না।

সেদিনকার সংবাদপত্রখানা পড়ছিলাম বোর্ডিংয়ে ধরা পড়েছে বিখ্যাত কালো ব্যবসায়ী প্রকাশ চৌধুরী। পুলিস অনেক খুঁজে, অনেক চেষ্টায় তাকে তার গ্রাম মানিকচকে গ্রেপ্তার করেছে।

পাকিস্থানের সঙ্গে চলতো তার চোরা কারবার। বৎসর সাত আট সে পাকিস্থানেই ছিল,—তারপর কিছুদিন যাবৎ সে এসেছিল হিন্দুস্থানে। পাকিস্থানের জন কত ব্যবসায়ী তাকে দিয়ে অনেক কাজ করাতেন, কলকাতায় সে বড় হোটেলে বাস করতো।

পুলিস এ পর্যন্ত তাকে ধরবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। গত সপ্তাহে পুলিশ খবর পেয়েছে সে প্লেনে কলকাতায় এসেছে. গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে উঠেছে। সেখানে গিয়ে পুলিস সন্ধান পেয়েছে সেই দিনই সে মোটরে কোথায় চলে গেছে। খোঁজ করে চতুর পুলিস অফিসার জেনেছেন সে মানিকচক নামে এক অখ্যাত নামা গ্রামে গেছে। সেই গ্রামেই একটা বাড়ী হতে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করেছে, তার বিচার আগামী সতেরই হবে।

আকাশ হতে গড়িয়ে পড়লাম মাটিতে।

সতেরোই সেপ্টেম্বর কলেজ কামাই করে কোর্টে উপস্থিত হয়েছিলাম।

এর মধ্যে দেশের লোক অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, প্রকাশের কথা কাউকে বলতে পারিনি, নিজেরই লজ্জা করছিল।

তবু মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ প্রকাশকে দেখবার জন্য ছুটলাম কোর্টে।

দেখলাম তাকে ;—

তেমনই হাসিমাখা মুখ, উজ্জ্বল দুটি চোখ। সব অভিযোগই সে অস্বীকার করলে।

আমার দিকে একবারও সে চোখ তুলে তাকায় নি, তাকালে ও চিনতো না এ কথা ঠিক।

মামলার তারিখ পেছিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বার হয়ে পড়লাম।

মহাপুরুষ অগস্ত্য

এক

নিবিড় বনের মধ্যে মহামুনি অগস্ত্য সমাধি মগ্ন রয়েছেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস তিনি অনাহারে অনিদ্রায় একভাবে সমাধি মগ্ন আছেন। তাঁর তপোতেজে তাঁর চতুঃসীমার মধ্যে কারও আসবার ক্ষমতা নাই।

ভগবানের আসন টলে ঋষির তপে, তাঁকে নেমে আসতে হয় মাটির পৃথিবীতে—

"বৎস অগস্ত্য—তুমি কি চাও— ?"

বার বার আহ্বান করেন নারায়ণ—অগস্ত্যের ইষ্ট দেবতা, কিন্তু অগস্ত্যের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

"বৎস অগস্ত্য—চক্ষু উন্মীলন কর, আমি তোমার ধ্যানে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে এসেছি। কি বর তুমি প্রার্থনা কর আমার কাছে বল ?"

এবার অগস্ত্যের ধ্যান ভঙ্গ হয়, শীর্ণদেহ মুনি চক্ষু উন্মীলিত করে দেখতে পান—তাঁর ধ্যানের দেবতা—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ তাঁর সামনে দণ্ডায়মান—

"প্রভু—প্রভু নারায়ণ, তুমি এসেছো— ?"

মুনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন—নারায়ণের পদতলে মাথা পেতে দেন, কাতর কণ্ঠে বলেন, "হে প্রভু, দেখা যখন দিয়েছো, আমি তোমায় ছাড়ব না। বর যখন দেবে—আমায় এই বর দাও, তোমায় আমি সর্বদা সামনে দেখতে পাই, তোমায় আমি আর যেতে দিতে চাই নে।"

হাসেন নারায়ণ, স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "পাগল অগস্ত্য, আমার যে অনেক ভক্ত আছে, তারাও তো আমাকে চায়। তাদের সবাইকে ছেড়ে আমি সর্বদা তোমার কাছে থাকতে পারিকি বৎস ? তোমায় আমি এই বর দিচ্ছি, তুমি তোমার মনে সর্বদা আমায় পাবে। যদি বিশেষ দরকার পড়ে, আমি তোমায় দেখা দেব।"

নারায়ণকে আবার প্রণাম করেন অগস্ত্য মুনি, মাথা তুলে আর তাঁকে দেখতে পান না, তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন।

মহানন্দে দুই হাত উপরে তুলে ঋষি অগস্ত্য নৃত্য করেন। তাঁর সাধনা সার্থক হয়েছে, তাঁর ইষ্ট দেবকে তিনি দর্শন করেছেন তাঁর আশীর্বাদ তিনি পেয়েছেন একি বড় কম সৌভাগ্য—

দিনের পর দিন—কত মাস বৎসর তাঁর অনাহারে কেটে গেছে। ইষ্টের দর্শনের পরে তিনি ক্ষুধা অনুভব করেন—এতকাল যার অনুভব মাত্র তাঁর ছিল না।

ধীরে ধীরে তিনি উঠলেন, আস্তে আস্তে বনের বাইরে এলেন।

লোকালয়ে আছে আহার্য, জীর্ণ দেহ মহামুনি মানুষের দ্বারে হাত পাতলেন—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি—"

শীর্ণ হলেও তাঁর সর্বাংগে জ্যোতি ফুটছে, তাঁর কাছে কারও যাওয়ার ক্ষমতা হয় না। লোকে ভয়ে ভক্তিতে মাথা নোয়ায়, থালা ভরে আহার্য নিয়ে এসে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে দেয়।

আহারান্তে শরীরে শক্তি পান অগস্ত্য,—

এরপর তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন।

দুই

দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত।

অহংকার তার বড় কম নয়,—সকলের চেয়ে সে বড় হতে চায়।

সারা পৃথিবী বিস্ময়ে তার বিশাল দেহের পানে তাকিয়ে থাকে। আগে বিন্ধ্য পর্বত বৎসরে বৎসরে সামান্য পরিমাণে বাড়তো—সকলের প্রণম্য হওয়ার আশায় সে দিন দিন নিজের দেহকে বর্দ্ধিত করতে লাগলো।

পৃথিবীর মানুষ তাকে প্রণাম করে, খেচর সমূহ তাকে লঙ্ঘন করে যেতে পারে না, বাধ্য হয়ে অনেক নিচে দিয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে যায়।

একমাত্র সূর্যদেব বিন্ধ্যকে বিন্দুমাত্র সম্মান দেখান না—। তিনি পূর্বদিকে উঠে দক্ষিণে বিন্ধ্যের মাথার উপর দিয়ে পশ্চিমে চলে যান—।

অসহ্য মনে হয় বিন্ধ্যের। দুনিয়ায় সকলের নিকট হতে সে প্রণাম লাভ করেছে, তার মাথার উপর দিকে কেউ যেতে পারে না, একমাত্র সূর্যই ব্যতিক্রম, তিনি বিন্ধ্যের মাথার উপর দিয়ে যান পশ্চিম দিকে।

একদিন বিন্ধ্য সূর্যদেবকে চলার পথে বাধা দিলেন, আদেশ দিলেন, আমাকে প্রদক্ষিণ করে যাও, মাথার উপর দিয়ে আমি তোমায় যেতে দেব না।"

মহাশক্তিবান দেবতা সূর্য ক্ষুদ্র পর্বত বিন্ধ্যের কথা গ্রাহ্য করলেন না,—তিনি উত্তর দিলেন, "আমার যে পথ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আমি আমার সেই পথেই চলব, তোমায় প্রদক্ষিণ করতে গতিপথ বদলাবার ক্ষমতা আমার নাই।"

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বিন্ধ্যপর্বত, ক্ষুদ্র সূর্যের স্পর্দ্ধা তিনি সহ্য করতে পারলেন না—তিনি যেমন করে পারেন—সূর্যের গতিপথ বন্ধ করবেন এই তাঁর একমাত্র পণ।

তিনি নিজেকে আরও স্ফীত করতে লাগলেন—যাতে তাঁর মাথা আকাশ স্পর্শ করে, সূর্যের গতিপথ তিনি বন্ধ করবেন, সূর্যের স্পর্দ্ধা তিনি গুঁড়ো করে দেবেন।

বিন্ধ্যের যে মূর্তি দেখে সূর্য সেদিন বিশ্রাম করতে গেলেন, পরদিন আর সে মূর্তি দেখতে পেলেন না।

সকালে নিজের গতিপথে চলতে চলতে সূর্য একবার তাকিয়ে দেখলেন সামনে বিন্ধ্যের বিরাট মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

স্তম্ভিত হন সূর্য—হয় তো মনে শঙ্কাও জাগে। চলতে গিয়ে বিন্ধ্যের কাছাকাছি এসে সূর্য দাঁড়ান,—তাঁর গতিপথ বিন্ধ্য বন্ধ করেছেন—

সূর্যকে দেখে বিন্ধ্য হাসেন—কথা বলেন না।

বুঝতে পারেন সূর্য—বিন্ধ্য তাঁকে দক্ষিণের পথ দিয়ে পশ্চিমে যেতে দেবেন না। তিনি অনুনয় করেন—"তোমার মাথা নত কর বিন্ধ্য—আমায় দক্ষিণ ঘুরে পশ্চিমে যেতে দাও। দক্ষিণ পশ্চিমের দেশ আলো পাবে না, তাদের অদৃষ্টে দিন আসতে দাও।"

বিন্ধ্য বধিরের ছলনা করেন—সূর্যের কথা তিনি শুনতে পাচ্ছেন না।

দক্ষিণ পশ্চিম দেশ সমূহ রইলো অন্ধকারে চাপা, সূর্যের আলো স্পর্শ হতে তারা বঞ্চিত রইলো দিনের পর দিন।

মুস্কিল হল অসীম শক্তিশালী সূর্যদেবের, নিজের কর্তব্য তাঁকে পালন করতেই হবে, কিন্তু পথ নাই; বিন্ধ্য বিরাট দেহ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কোন দিক দিয়ে এতটুকু ফাঁক পাওয়ার উপায় নাই।

ফিরতে পারেন না সূর্য,—স্থবীর প্রায় একই স্থানে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

স্বর্গরাজ্যে দেবতারা প্রমাদ গুনেন,—সৃষ্টির ব্যতিক্রম হয়—বিন্ধ্যকে তাঁরা বুঝাতে আসেন; কিন্তু বধির বিন্ধ্য, কোন কথা তিনি কানে তোলেন না।

দেবতাদের মধ্যে পবন সর্বস্থানে যাতায়াত করেন, ত্রিভুবনের সব খবর তাঁর নখদর্পণে। বিন্ধ্যকে অনুনয় বিনয়ে ও নত করতে না পেরে দেবগণ বিমর্ষ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন।

সেই সময় পবন বলে দেন—"বিন্ধ্য একমাত্র মাথা নত করে তার গুরু অগস্ত্য

মুনির কাছে—তাঁর কথা তিনি শোনেন। যদি কোন রকমে ঋষি অগস্ত্যকে এখানে আনা যায়, বিন্ধ্যকে মাথা নত করতেই হবে।"

অগস্ত্যমুনির সন্ধানে তাঁকেই পাঠানো হল।

উত্তর ভারতে ঋষি অগস্ত্য ভ্রমণ করছিলেন, পবন তাঁর কাছে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। সবিনয়ে সব কথা বিবৃত করে করযোড়ে বললেন, "মহামুনি, সৃষ্টি রক্ষা করতে আজ আপনাকেই দেবতাগণের প্রয়োজন। সূর্য বিন্ধ্যের উত্তরে আটক পড়েছেন সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশ হাহাকারে পূর্ণ। রৌদ্রের অভাবে সেখানকার গাছপালা বিবর্ণ হয়ে মরে যাচ্ছে, জীবেরা নানা ব্যারামে আক্রান্ত হচ্ছে। আপনি বিন্ধ্যের গুরু, আজ বিন্ধ্যকে নত করতে পারেন একা আপনি, দেবগণ বিন্ধ্যের কাছে পরাজিত হয়েছেন। আপনি চলুন,—সূর্যের গতিপথ মুক্ত করুন।"

মহামুনি অগস্ত্য পবনদেবের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

মহাগুরুকে সামনে দেখে উদ্ধত বিন্ধ্য নত মস্তকে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং হঠাৎ আসার কারণ জানতে চাইলেন।

তাঁর মাথায় হাত রেখে খুসি মনে অগস্ত্য বললেন—"তোমার ভক্তি শ্রদ্ধাই তোমার চিরকাল অটুট রাখবে বৎস। আমি এই পথ দিয়ে যেতে তোমায় একবার দেখে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি। আমি উত্তর দেশে যাচ্ছি, সত্বরই ফিরব। যতদিন না ফিরি তুমি নত মস্তকে থাকবে এই আমার অনুরোধ বা আদেশ জেনে রেখো।"

সেদিন ছিল ভাদ্রমাসের পয়লা তারিখ। অগস্ত্য সেইদিন উত্তর দিকে যাত্রা করলেন, আর তিনি ফিরে এলেন না। গুরুর আদেশে বিন্ধ্য নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন, সূর্যের গতিপথ বাধা শূন্য হল।

সেই সময় হতে প্রতিমাসের পয়লা তারিখ অগস্ত্য যাত্রা নামে বিখ্যাত হয়েছে।

তিন

মহামুনি অগস্ত্যকেও একদিন বিপদে পড়তে হল।

এক যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি বিবাহিত না হওয়ায় পিতৃপুরুষের কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করবার অধিকারী হতে পারলেন না।

বিবাহ তাঁকে করতেই হবে, পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করা দরকার।

কিন্তু তাঁর উপযুক্ত পাত্রী কোথায়?

অনেকদিন পরে তাঁর যোগ্য পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। বিদর্ভ-রাজকন্যা পরমা সুন্দরী ও অশেষ গুণবতী মেয়ে লোপামুদ্রা তাঁর উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচিতা হলেন।

এই রুক্ষস্বভাব শ্রেষ্ঠ মহামুনিকে লোপামুদ্রা মনে মনে কবে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তাঁর পিতামাতা জানতেন অগস্ত্য ব্যতীত লোপামুদ্রা আর কাউকে পতিত্বে বরণ করবেন না,—জানলেও তাঁরা সাহস করে সেকথা কাউকে বলতে পারেননি।

অগস্ত্য যেদিন নিজেই লোপামুদ্রাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করে পাঠালেন, সেদিন রাজারাণী আনন্দ পেলেও কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে দুঃখ ও পেলেন। রাজকন্যা লোপামুদ্রা যাবেন দরিদ্র তপস্বী অগস্ত্যের গৃহে, সেখানে তাঁর জীবন যে স্বাচ্ছন্দে কাটবে না সে জানা কথা।

তবু তাঁরা অমত করতে পারলেন না—কারণ কন্যা অগস্ত্য ছাড়া আর কাউকেই বিবাহ করবেন না।

একদিন মহা ধুমধামে অগস্ত্যের সঙ্গে লোপামুদ্রার বিবাহ হল। বিবাহের পর পিতৃগৃহের অলংকার, বসনাদি ফেলে গৈরিক বসন পরে লোপামুদ্রা স্বামী গৃহে গেলেন।

বনের মধ্যে পর্ণকুটির—

বিবাহের আগে এ কুটিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়, অগস্ত্য প্রায় বাইরেই ঘুরতেন,—কিন্তু এখন বিবাহ করে তাঁকে সেই কুটিরে রীতিমত সংসার পাততে হল।

ভগবানকে ধ্যান করবার সময় হয় না, কাতর অগস্ত্য প্রার্থনা করেন, "আমার এ কি করলে প্রভু, কেন আমার বিবাহ করবার কুমতি হল ? পিতৃপুরুষ এক গণ্ডুষ জল নাহয় নাই পেতেন, দেহান্তে আমার আত্মা না হয় কষ্ট পেত, আমায় এ জীবনে এ কষ্ট পেতে হতো না, তোমায় হারাতে হতো না।"

অগস্ত্য ভগবানের বাণী শুনতে পান,—চোখ মুদে অন্তরে ভগবানের মূর্তি দেখতে পান, অভয় আশীষ পান তিনি।

কিন্তু এই কি সংসার ?

তাঁকে আহারেন্বষণে ঘুরতে হয়, দূর বন হতে কাষ্ঠ আহরণ করতে হয়, এরকম বহু কাজ করতে হয়।

অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি, মনে হয় সংসার ফেলে চলে যাবেন, আর ফিরবেন না।

লোকের মুখে শুনতে পান—দানবরাজ ইল্বল নাকি প্রচুর দান করেন,—তাঁর কাছে গেলে অগস্ত্য প্রচুর অর্থ পাবেন।

লোপামুদ্রাকে সে কথা জানালেন অগস্ত্য।

শংকিত হয়ে ওঠেন লোপামুদ্রা,—

যুক্ত করে নতনেত্রে তিনি বললেন, "কিন্তু প্রভু, ইল্বল দানবরাজ, বদান্যতা তার থাকতে পারে, অন্যদিক দিয়ে অনিষ্ট করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।"

অগস্ত্য সাহস দেন, "নির্ভয়ে থাকো তুমি, দানবের ক্ষমতা নাই যে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করবে। ইল্বল শুনেছি দাতা,—দেখি, যদি তার কাছ হতে সাহায্য পাই—তোমার সংস্থান করে আমি কিছুদিনের জন্য তপস্যা করতে যাব, নিরন্তর সংসারের কাজ করা আমার আর ভালো লাগছে না, মন ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

লোপামুদ্রা আর কথা বলতে পারেন না।

চার

দানবরাজ ইল্বল—

দুই ভাই, ছোট বাতাপি দাদার দক্ষিণ হস্ত, ধরতে গেলে তার পরামর্শ নিয়ে ইল্বল রাজ্যশাসন করে।

রাজসভায় সিংহাসনে আসীন ইল্বল, পাশে তার ভাই বাতাপি,—

রাজকার্য চলছে, এমনই সময় অগস্ত্য গিয়ে সিংহাসনের সামনে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণের সর্বত্র অবাধ গতি তাই দ্বারী তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। ব্রাহ্মণ অগস্ত্য সোজা এসে ইল্বলের রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

মহামুনি অগস্ত্যের নাম জগৎ বিখ্যাত—দানবেরা ও তাঁকে চেনে। ইল্বল তাড়াতাড়ি সিংহাসন হতে নেমে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে, সভায় যত দানব ছিল সকলেই অগস্ত্যকে প্রণাম করলে।

ইল্বল মহামুনিকে বসবার জন্য আসন দিতে আদেশ করলে—সবিনয়ে করযোড়ে অনুরোধ করে—"মহামুনি আসনে বসুন। কি প্রয়োজনে আজ দানব সভায় এসেছেন বস কথা বলে আমাদের কৃতার্থ করুন।"

আসল কথা—দানবরাজ ইল্বল বহুপূর্বেই কারণ অনুমান করেছে, তবু ও অগস্ত্যের মুখে শুনতে চায়।

খুসি হন অগস্ত্য—রাজা ও রাজসহোদরের ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁকে প্রচুর আনন্দ দেয়।

বললেন, "দানবরাজ, তোমার ভাণ্ডারে বহু ধন সঞ্চিত আছে, আমি কিছু ধন প্রার্থনা করি। তুমি জানো আমি বিবাহ করেছি অথচ সংসার প্রতিপালন করা আমার সাধ্যাতীত। সংসারের প্রতি কর্তব্য পালন করতে আমি ভগবানের নাম স্মরণ করবার অবসর পাচ্ছি নে। সেই অর্থাভাব দূর করবার মানসে আমি তোমার কাছে এসেছি—তোমার অসীম ধন হতে আমায় কিছু দান কর।"

প্রফুল্ল মুখে ইল্বল বললে, "প্রভু, এত মহান লোক থাকতে আপনি যে এই অধম দানবরাজকে স্মরণ করে এখানে এসেছেন, তাতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত

মনে করছি। আপনার বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। তবে আপনাকে আমি অভুক্ত অবস্থায় ছাড়তে পারব না—এখানে আহারাদি করে দক্ষিণা নিয়ে আপনি বৈকালে যাত্রা করবেন।"

অগস্ত্য রাজি হন।

কাল মধ্যাহ্নে তিনি ভোজন করেছেন, তারপর আর কিছুই আহার করেননি। আজ দানব ভবনে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন শেষ করে প্রচুর অর্থসহ তিনি নিজ আলয়ে গমন করবেন। কাল দিনমানটা সাংসারিক কাজ শেষ করে পরশু সকালে আবার তপস্যায় গমন করবেন এই তাঁর অভিপ্রায়।

দানবরাজ ইল্বল পাদ্য অর্ঘে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেও তার মতলব ছিল আলাদা।

মুখের উপর সে বলতে পারে না মুনিকে একপয়সাও সে দেবে না, কারণ অভিশাপের ভয় আছে। এই সব মহামুনি—বিশেষ অগস্ত্যের মত মুনি এককথায় যেমন বিগলিত হন, এককথায় চক্ষুর আগুনে বিশ্ব ধ্বংস করেন,—এঁদের বিশ্বাস করা যায় না।

ইল্বল চায়—ঋষিকে সন্দেহের অবকাশ মাত্র না দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে।

সেই জন্যই সে ভূরি ভোজের আয়োজন করে।

দানব বাতাপি মুহূর্তে মৃগমূর্তি ধারণ করে। ইল্বল দানব পাচককে দিয়ে সেই মাংস রন্ধন করায়।

অগস্ত্যকে উপযুক্ত আসন জল দিয়ে সোনার থালা বাটিতে করে মাংসভাত পরিবেশন করা হয়। ইল্বল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর আহারের তত্ত্বাবধান করে।

ঋষি পরিতৃপ্তি সহ ভোজন করেন, একটি ভাতের দানা বা মাংসের একটুকরা হাড় পর্যন্ত ফেললেন না, নিঃশেষে সব খেয়ে ফেললেন।

যখন তিনি আহার শেষে গণ্ডুষ করছিলেন—সেই সময় প্রতীক্ষারত ইল্বল তিনবার হাত তালি দিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে ডাকে—"বাতাপি—বাতাপি—বাতাপি—"

ঋষি অন্তর্যামী, অনেক আগেই তিনি ধ্যানে জেনেছিলেন ইল্বল এই ভাবেই

মানুষকে হত্যা করে। বাতাপি মৃগ মূর্তি ধরে মাংসরূপে উদরে থাকে, মন্ত্র বলে তিনবার তালি দিয়ে ইল্বল আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে বাতাপি উদর চিরে বার হয়ে আসে,—মানুষ সেই মুহূর্তে মারা যায়।

এবার ব্যর্থ হয় ইল্বল—

আচমন শেষে মুনি উঠে দাড়ালেন, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "বাতাপিকে আমি সঙ্গে সঙ্গে হজম করে ফেলেছি ইল্বল, তাকে আর পাবে না। আর তুমি—"

ঋষির তুই চোখে আগুন জ্বলে—"তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছো, আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছো। জানো—আমি তোমায় এখনই ভস্ম করতে পারি?"

ইল্বল মুনির পদতলে লুটিয়ে পড়লো, তাঁর দয়া প্রার্থনা করতে লাগলো।

মহাতেজা হলেও অগস্ত্য মানুষ, তিনি ইল্বলের কাতরতা দেখে তাকে ক্ষমা করলেন।

ইল্বল প্রচুর ধনসম্পত্তি ঋষিকে প্রণামী দিলে, ঋষি গৃহে ফিরলেন।

পাঁচ

সংসারের দায়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঋষি অগস্ত্য ভগবানের আরাধনা করবার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন।

চললেন সমুদ্রের দিকে—

মহাসমুদ্রে স্নান করে শুদ্ধ মনে অগস্ত্য ধ্যানে বসলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে অভীষ্টের ধ্যান করবার সুযোগ তিনি পেলেন না।

দেবতাদের চিরশত্রু অসুরগণ স্বর্গ মর্ত কোথাও স্থান না পেয়ে সমুদ্রগর্ভে স্থান নির্বাচন করেছে। দেবগণ যখন নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাতে যান, অসুরেরা অতি গোপনে সমুদ্রগর্ভ হতে উঠে স্বর্গ রাজ্যে হানা দিয়ে ভীষণ উপদ্রব করে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন দেবগণ।

অসুরদের সঙ্গে সামনা সামনি যুদ্ধ করার কোন উপায় নাই। সুসজ্জিত

হয়ে দেবগণ বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুরেরা সমুদ্রগর্ভে ডুব দেয়। দেবতাদের হাতের অস্ত্র হাতেই থাকে, ইন্দ্রের বজ্র পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

অস্থির হয়ে ওঠেন দেবগণ—অসুর দমন করবার সমস্ত কৌশল তাঁদের পণ্ড হয়।

অবশেষে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, পবন প্রভৃতি দেবগণ এসে দাঁড়ান অগস্ত্যের কাছে।

দেবগণের আগমনে অগস্ত্যের ধ্যান ভঙ্গ হয়, তিনি চক্ষু উন্মীলিত করে দেবগণকে নিজের চারিপাশে করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান।

জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা এখানে কেন, স্বর্গের সব কুশল তো?"

ম্লান হাসি হেসে ইন্দ্র বললেন, "মহামুনি, একবার আপনার জন্যই আমার স্বর্গরাজ্য রক্ষা পেয়েছে, সেকথা দেবগণ ভোলেনি। বিন্ধ্য স্বর্গরাজ্য অধিকার করবার বাসনা করেছিল—কেবল মর্তে বিপুল স্থান নিয়ে সে খুসি হতে পারেনি। আপনি সে যাত্রা কেবল সূর্যের গতিপথ মুক্ত করেননি, দেবগণের স্বর্গরাজ্যকেও রক্ষা করেছিলেন। আজ আবার আপনার শরণাপন্ন হয়েছি কারণ স্বর্গ আবার বিপন্ন হয়েছে। অসুরেরা স্বর্গে এমন অত্যাচার করছে যাতে আমাদের কাজকর্ম করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এরা এই সমুদ্রের গর্ভে বাস করছে—জলের উপর পৃথিবী বা স্বর্গ কোথাও এরা স্থান পায়নি। এখান হতে বার হয়ে গোপনে স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হয়ে উপদ্রব করে, দেবগণ প্রস্তুত হয়ে বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা পালিয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেয়—যেখানে আমাদের যাতায়াত দুঃসাধ্য। মহা ঋষি, দয়া করে এ যাত্রা আমাদের রক্ষা করুন।"

"আমি—আমি কি করতে পারি?"

অগস্ত্য চিন্তা করেন।

দেবগণ করযোড়ে প্রতীক্ষায় থাকেন।

মুনি বললেন, "বেশ, আমি উপায় দেখছি। আপনারা প্রস্তুত হোন দেবগণ, অসুরদের আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করব।"

দেবগণ তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করেন।

অগস্ত্য ভগবানের নাম স্মরণ করে সমুদ্রের জল গণ্ডুষ করে পান করেন।

নিমেষে সমুদ্রের সমস্ত জল শুকিয়ে যায়—

অসুররাজ্যে হাহাকার পড়ে যায়। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা তাদের কল্পনারও অতীত। সমুদ্রের বিপুল জলরাশি এক নিমেষে শোষণ করলে কে, তা তারা বুঝতে পারে না।

দেবগণ অস্ত্র বর্ষণ করেন, ইন্দ্রের বজ্র মুহুর্মুহু গর্জন করে। নিমেষে স্বর্গ-রাজ্যের শত্রু অসুরকুল নিহত হয়। অগস্ত্য সমুদ্রকে আবার মুক্ত করে দিলেন—তাঁর মুখ দিয়ে উচ্ছিষ্টরূপে নয়, দেহ দিয়ে সমুদ্রের জল বহির্গত হল।

মহাতুষ্ট হলেন দেবগণ—

অগস্ত্যের মাথার উপর স্বর্গরাজ্য হতে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো।

মহাঋষি অগস্ত্য এইরকমে বারবার স্বর্গ-মর্ত্যের কল্যাণ সাধন করে গেছেন—

তাই তাঁর নাম পুরাণে এত প্রসিদ্ধ, হিন্দু আজও তাঁকে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করে।

রাক্ষসের মুক্তি

এক

দিন বেশ সুখ শান্তিতেই কেটে যায়।

কেবল রাজার দিনই সুখ শান্তিতে কাটে না, প্রজারাও পরম শান্তিতে দিন কাটায়। রাজা বীরবাহুর রাজ্যে দুঃখ শোক নাই,—রাজ্যে অভাব অনটন নাই। ক্ষেত্রে যা ফসল হয়, প্রজাদের ঘরে তা উপচে পড়ে। অনাহার কাকে বলে এ রাজ্যের কেউ তা জানে না তাই এখানে ভিখারী দুঃখী কেউ নাই। এখানে সবাই কাজ করে, কেউ ক্ষেতখামারের কাজ, কেউ বাড়ীঘর তৈরীর কাজ, কেউ পথ তৈরী করে; কেউ সেকরা, কেউ কামার কুমার সুত্রধরের কাজ করে। যদিও অভাব নাই, তবুও কেউ অলসভাবে শুয়ে বসে দিন কাটায় না।

রাজবাড়ীতে আছেন রাজা বীরবাহু—তাঁর রাণী, একটি মাত্র পুত্র। এ ছাড়া আছেন কত আত্মীয়স্বজন, কত দাসদাসী, সিপাই শান্ত্রী, পাত্র মিত্র মন্ত্রী সেনাপতি— অগস্তি সৈন্য।

যুদ্ধ নাই তবুও রাজার সম্মানে আছে হাজার হাজার সৈন্য—যথানিয়মে

এরা কুচকাওয়াজ করে, মার্চ করে নগরের পথে পথে। রাজা যখন শিকারে যান, সঙ্গে চলে কাড়া নাকাড়া বাঁশী, সঙ্গে চলে হাজার হাজার সৈন্য পাত্র মিত্র, সেনাপতি প্রভৃতি।

পরম সুখে রাজার দিন কাটে।

দুই

অকস্মাৎ সারা নগরে জেগে উঠলো আতংক। রাজবাড়ীতে প্রজাদের কথা পৌঁছায় না,—মন্ত্রী করযোড়ে রাজার সিংহাসনের পাশে দাঁড়ান।

রাজা বীরবাহু জিজ্ঞাসা করেন, "কি খবর মন্ত্রী ?"

মন্ত্রী ভীতকণ্ঠে উত্তর দেন, "মহারাজ, নগরের পাশে আপনার শিকারের জন্য বন্যজন্তু ভরা যে জংগলটি আছে, সেখানে নাকি এক অদ্ভুত প্রাণীকে দেখা গেছে। এত বড় বিরাট দেহ কেউ কোনদিন দেখেনি—যেন একটা পর্বত। আপনার শিকারের জন্যে সে বনে যত জীবজন্তু ছিল, সেই প্রাণীটা এই দু'তিন দিনে সব প্রায় শেষ করে ফেলেছে।"

রাজা চিন্তিত হন, ক্রোধ হয় তাঁর।

একজন পাত্র বললেন, "হ্যাঁ মহারাজ, আমিও শুনেছি! আমার দ্বারোয়ান সেই বনের পথ দিয়ে আসছিল, সে আর ফিরে আসেনি। কয়জন কাঠুরিয়া সেই বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল, তারা বললে একটা মস্ত বড় কালো হাত এসে দ্বারোয়ানের গলাটা চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেল। কাঠুরিয়ারা আর কাঠ কাটতে পারেনি, ভয়ে তারা পালিয়ে এসেছে, আর ও বনের দিকে কেউ যাচ্ছে না। তারা বলছে—এমন হাত তারা কেউ কখনও চোখে দেখেনি,—যেমন কালো, তেমনি হাতভরা বড় বড় লোম। প্রজারা মহারাজের কাছে তাদের আবেদন জানাতে চায়, অনুমতি হলে তাদের দরবারে ডাকব।"

রাজা রাগ করে বললেন, "ডাকবার আর দরকার নেই। সমস্ত রাজ্যে প্রচার

করে দিন, আমি কাল শিকারে যাব। প্রাণীটা নিশ্চয় সেই বনেই আছে, আমি তাকে জীবন্ত ধরে এনে আমার চিড়িয়াখানায় রেখে দেব, লোকে সামনা সামনি তাকে দেখতে পাবে।”

মন্ত্রী থতমত খেয়ে যান, রাজার মুখের উপর কিছু বলতে পারেন না।

জীবনে কোনদিন কোন যুদ্ধ বিপ্লব, কোন বিদ্রোহ দেখেন নি রাজা বীরবাহু,—এর কল্পনাও যিনি করতে পারেন না, তাই বৃহদাকার জীবটিকে ধরে এনে চিড়িয়াখানায় রাখতে চান। বাড়ীর বাইরের মাঠটায় তিনি চিড়িয়াখানা তৈরী করেছেন। সেখানে আছে বাঘ, ভালুক, হাতী, সিংহ; আছে হরিণ, শিয়াল, সজারু, বেঁজি এমন কি সাপ, কুমীর, টিকটিকি, গিরগিটিও বাদ যায়নি। প্রতিদিন সকালে তিনি তাঁর ঘেরা চিঁড়িয়াখানা পরিদর্শন করেন, সঙ্গে থাকে তাঁর নয় বৎসরের বালক পুত্র রামচন্দ্র। জীবজন্তু দেখতে সে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং বিশেষ করে তার জন্যই তিনি চিঁড়িয়াখানা তৈরী করেছেন।

রাজা শিকারে যাবেন, তার উদ্যোগ আয়োজন চলে।

রামচন্দ্র ধরে বসলো—সেও যাবে।

কিছুতেই তাকে ঠেকানো যায় না। তখনকার মত চুপ করে থাকলেও রাজা যখন সসৈন্যে নগরের বাইরে গিয়ে পৌঁচেছেন, দেখতে পেলেন, রামচন্দ্র একটা তেজী ঘোড়ায় উঠে সৈন্যদের মাঝখানে চলেছে।

রাজা পুত্রকে নিজের কাছে ডাকলেন, গম্ভীর মুখে বললেন, “এ রকম ভাবে আসা তোমার খুব অন্যায় হয়েছে। আমি জানিনে সেটা কি জন্তু, রাক্ষস বা আর কিছুও হতে পারে। বনে যাওয়ার পর কি হবে তাও আমি জানিনে,—সেই জন্যেই তোমায় নিয়ে যেতে চাইনি। যাক, এসেছো যখন, আমাদের পাশে পাশে থাকবে, সেনাপতি বজ্রসেন তোমায় দেখবেন।”

রাজা বজ্রসেনকে আদেশ দিলেন, “রাজকুমারকে তিনি যেন নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখেন।”

নগরের সীমান্তে বিপুল অরণ্য সুরু, সে অরণ্য কোথায় কতদূরে শেষ হয়েছে

তা কেউ জানে না। এ রাজ্যের কাঠুরিয়ারা সে বনে কাঠ কাটতে যায়,—খুব বেশীদূর তারা যায় না, সামনাসামনি যা কাঠ থাকে কেটে এনে সহরে বিক্রয় করে। রাজা মাঝে মাঝে শিকার করতে যান, গেলেও তিনি জানেন না—এ বন কত বড়, কোনখানে এর শেষ হয়েছে।

জানবার কোন দরকার হয় না—শিকার করে রাজা ফিরে আসেন, ভিতরে বেশীদূর যাওয়ার দরকার তাঁর নাই।

তিন

কাড়া নাকাড়া বাজে—ঝম ঝম ঝম—তার সঙ্গে হাজার বাঁশী, হাজার কাঁসি, কানে যেন তালা ধরে যায়।

কই, কারও সাড়াশব্দ তো পাওয়া যায় না—বিরাট আকৃতি সে প্রাণীটা হয়তো ভয়ে ভিতরে পালিয়েছে।

রাজা বনের পথে সকলের আগে ঘোড়া ছুটান, তাঁর হাতে ঢাল তলোয়ার, ধনুক, পিঠে তূণভরা তীর, পিছনে পিছনে চলে সৈন্যদল, সেনাপতির পিছনে চলে রাজকুমার।—

"হাঁউ মাউ খাঁউ—মানুষের গন্ধ পাঁউ রে—"

সে কি ভীষণ আওয়াজ, হাজার মেঘ একসঙ্গে ডাকলে যে ভীষণ শব্দ হয়, সেই রকমই।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় রাজার সৈন্য—স্বয়ং রাজা বীরবাহুও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

মনে পড়ে ছোটবেলায় রাক্ষসের গল্প শুনেছেন—তারা নাকি হাঁউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে ছুটে আসতো,—মেঘের ডাকের মতন গর্জন তাদের, এ তো ঠিক তাই।

সৈন্যসামন্তরা দেখতে পায়—পাহাড়ের মত বিরাট দেহ কি একটা তাদের দিকে ছুটে আসছে। তার পায়ের চাপে মাটি থর থর করে কাঁপছে, গায়ের ধাক্কায় বড় বড় গাছগুলো মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ছে।

"ওরে বাপরে—রাক্ষস—রাক্ষস—"

বলতে বলতে সৈন্যসামন্ত কাড়া নাকাড়াওয়ালা সব তীরবেগে নগরের দিকে ঘোড়া ছুটালো। কত সৈন্য ছুটতে গিয়ে ঘোড়া হতে ছিটকে পড়লো,—কে কোথায় গেল কোন ঠিক নেই।

পিছনে ছুটছে রাক্ষস—

রাজা গুরুতর অবস্থা দেখে ঘোড়া হতে লাফিয়ে পড়ে একটা বড় গাছের আড়ালে লুকালেন। ভয়ে তাঁর বুক কাঁপছে,—কানে কিছু শুনতে পাচ্ছেন না, রাক্ষসের চীৎকার শব্দে দুই কানে ভীষণ তালা লেগেছে।

রাক্ষস চলতে চলতে ঘোড়াটাকে একমুঠোয় ধরে বিরাট মুখের মধ্যে ভরলো, তারপর আবার সৈন্যদের পিছু নিলে।

রাজা ভয়ে থর থর করে কাঁপেন, বুঝতে পারেন না এখন তিনি কি করবেন। তাঁর সামনেই ওদিকে রাক্ষস টপাটপ সৈন্যদের ধরে মুখে পুরে গিলে খাচ্ছে, চিবানোর সময় পর্যন্ত তার নাই।

রাজকুমার কোথায় গেল—রাজা অস্থির হয়ে ওঠেন। নিজের জন্য যত না ভাবেন, রাজকুমারের জন্যই ভাবনা হয় বেশী।

তিনি গাছের আড়াল হতে দেখতে পান—রাক্ষস বেশ পরিতৃপ্তি সহ আহার করেছে, পেটটা তার খুব বড় হয়ে উঠেছে এবং সেইজন্যই আর এগিয়ে না গিয়ে ফিরলো।

হাতে করে সে কি একটা নিয়ে যাচ্ছে—তার বিরাট হাতের তালুতে বিন্দুর মত কি দেখা যায়—

কাছাকাছি আসতে রাজা দেখতে পান, রাক্ষসের হাতের তালুতে পড়ে আছে তাঁর প্রাণাধিক পুত্র। রাক্ষসের হাতের তালুতে তাকে দেখাচ্ছে ছোট একটি পুতুলের মত। সে হাত পা ছুঁড়ছে, চীৎকার করে কাঁদছে। তার কান্না রাক্ষসের কানে মৃদু শীষ দেওয়ার মত শোনালেও রাজা স্পষ্ট শুনতে পান।

আর গোপনে থাকতে পারেন না তিনি, কোষ হতে তরবারি বার করে সদর্পে

রাক্ষসের সামনে এসে দাঁড়ালেন, চীৎকার করে বললেন, "থাম—থাম বলছি, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে, ওকে নামিয়ে দে, নইলে তোকে হত্যা করব সয়তান।"

রাক্ষস নিচু হয়ে দেখলে—তার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু একটা মানুষ পিঁ পিঁ করে তাকে যেন কি বলছে। ভারি মজা লাগে তার, সে পা দিয়ে মানুষটাকে নাড়তে যায়।

রাজা তার তীক্ষ্ণধার তরবারি দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে তার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন,—রাক্ষসের পায়ের চামড়ায় সামান্য একটু বেদনা অনুভূত হল মাত্র। বিকৃত মুখে সে রাজাকে পা দিয়ে সরিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে।

রাজকুমার পিতাকে চিনতে পেরেছে, সে দ্বিগুণ চীৎকার করে কাঁদছে—"বাবা, আমায় বাঁচাও। আর কখনও তোমার অবাধ্য হব না, যা বারণ করবে তাই শুনব। তুমি আমায় এর হাত হতে নামিয়ে নাও।"

রাক্ষস বড় বড় পা ফেলে চলতে থাকে—গভীর বন তার লক্ষ্যস্থল। পিছনে পিছনে ছুটছেন রাজা বীরবাহু, চীৎকার করে বলছেন, "কেঁদ না, আমি যেমন করে পারি তোমায় উদ্ধার করব—আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

কিন্তু রাজা ছুটতে পারবেন কেন? রাক্ষস লম্বা পা ফেলে গভীর বনের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, রাজা পড়ে রইলেন অনেক দূরে।

চার

ছোট্ট ছেলেটাকে দেখে রাক্ষসের বড় ভালো লেগেছিল।

গভীর বনের ওপারে উঠেছে যে বিরাট পর্বতশ্রেণী, তারই একটা প্রকাণ্ড গহ্বরে থাকে লম্বকর্ণ, আর থাকে তার একটি মাত্র ছোট্ট মেয়ে হিড়িম্বা। আজ শিকারের জন্য বার হওয়ার সময় মেয়েটা বড় কেঁদেছিল, মাতৃহীনা মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে লম্বকর্ণ—"কাঁদিসনে হিড়িম্বা, আমি তোর খেলার জন্যে যা পাই নিয়ে আসব।"

ভগবান আজ যে এমন সুন্দর একটি পুতুল মানুষ জুটিয়ে দেবেন লম্বকর্ণ তা ভাবতে পারেনি। মানুষগুলোকে ধরে টপাটপ মুখে তুলবার সময় দৃষ্টি পড়লো রামচন্দ্রের দিকে। বাঃ—চমৎকার পুতুলটা তো। মাথায় ঝলমল করছে মুকুট, হাতে গলায় ঝিকমিক করছে গহনা—বেশ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, এই পুতুলটাকে নিয়ে গিয়ে সে হিড়িম্বাকে দেবে, এই মানুষ পুতুলটাকে পেলে হিড়িম্বা ভীষণ খুসি হবে। সারাদিন পিতা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে সে আর কাঁদবে না, মানুষ পুতুলের সঙ্গে খেলা করবে।

পর্বতগুহার সামনে দাঁড়িয়েছিল তার ছোট্ট মেয়ে হিড়িম্বা, পিতার আশায় সে পথপানে চেয়েছিল। পিতার হাতে রামচন্দ্রকে দেখে সে প্রথমে আশ্চর্য, পরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—"ও বাবা, তোমার হাতে ওটা কি, আমার জন্যে তুমি কি এনেছো ?"

পিতা পরম স্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "তোর জন্যে একটা জ্যান্ত মানুষ পুতুল এনেছি মা—এই দেখ, এ চমৎকার হাঁটতে পারে, পিঁ পিঁ করে কথা বলে, কাঁদে গান করে।"

বলতে বলতে সে রামচন্দ্রকে মাটিতে নামিয়ে দিলে।

উঃ, এতক্ষণ রাক্ষসের হাতের তালুতে বসে থেকে রামচন্দ্রের সমস্ত শরীর যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মাটিতে দাঁড়িয়ে সে খানিক আড়ামোড়া ছাড়লো, লাফালো, দৌড়ালো, তারপর ঘুরে এসে হিড়িম্বাকে ভালো করে দেখলে।

না, মেয়েটা নেহাৎ মন্দ নয়। মাথায় তার ডবল, চওড়ার দিকেও তেমনি, তবু মনে হয় ছেলেমানুষ, বয়স হয়তো তার সমান—কি তার চেয়েও দুএক বছরের ছোট, কেবল রাক্ষসের মেয়ে বলেই অত লম্বা চওড়া।

হিড়িম্বা পরম স্নেহে পুতুলকে কোলে টেনে নিয়ে তার গায়ে হাত বুলালো। মানুষের গন্ধে জিভে যেন জল আসে, খুব সামলে নেয় সে নিজেকে। তার সঙ্গীর সঙ্গে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ সে ভুলে যায়, খেলার আনন্দে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

পুতুলকে কোলে নিয়ে সে গুহার মধ্যে ঢোকে। লম্বকর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের

কাজে যায়, মেয়েকে বলে যায়—"আমার ফিরতে আজ দেরী হবে। তোর খাবার রইলো—নিজে খাস, তোর পুতুলকেও দিস।"

হিড়িম্বা নিজের খেলার জিনিস দেখায় পুতুলকে। কথা কেউ কারও বোঝে না, ইঙ্গিতে ইসারায় পরস্পরকে বুঝায়। কেবল খাবার বেলায় হল বড় মুস্কিল।

মস্ত বড় একটা গামলায় গত পরশু দিনের হাতীর মাংস সঞ্চয় করা আছে। পরশু সকালে লম্বকর্ণ একটা হাতী শিকার করে মেয়ের জন্য রেখেছে; পরশু এবং কাল সেই মাংসে হিড়িম্বার চলেছে, আজও আছে।

হিড়িম্বা নিজের ভাগ রেখে পুতুলকে খানিকটা মাংস খেতে দেয়,—পুতুল কিছুতেই খায় না।

মুস্কিলে পড়ে হিড়িম্বা,—কিছু না খেলে তার পুতুল মরে যাবে। মাংস সে খাবে না, তবে কি খাবে?

পুতুলই মীমাংসা করে দিলে।

হিড়িম্বার হাত ধরে সে গুহার বাইরে আসে। এদিক ওদিক তাকাতে চোখে পড়ে কলাবাগান, অনেক কলার কাঁদি ধরেছে, অনেক কলা পেকেছে। এদিক ওদিক নারকেল গাছ, খেজুর গাছ প্রভৃতি দেখা যায়। রামচন্দ্র ইসারায় বুঝিয়ে দেয়—সে মাংস খায় না, ফল খায়।

যাক, একটা উপায় পাওয়া গেল। পুতুলকে বাঁচাবার জন্য হিড়িম্বা সব কাজ করতে পারে।

তার গায়ে জন্তুর চামড়া জড়ানো,—চামড়াই তাদের লজ্জা নিবারণ করে। এক হাতে গায়ের চামড়া সামলে আর এক হাতে কলা নারকেল প্রভৃতি ফল সে সংগ্রহ করে নিয়ে এলো।

বড় ক্ষুধা পেয়েছিল, রামচন্দ্র কলা খেয়ে উদর পূরণ করলে, ঝরণার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করলে।

হিড়িম্বাকে তার ভালোই লাগলো। কণ্ঠস্বরটা তার ভালো নয়,—মোটের উপর ব্যবহার ভালো।

অনেক রাত্রে লম্বকর্ণ ফিরে দেখলে—পুতুলকে পাশে নিয়ে হিড়িম্বা ঘুমাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হল লম্বকর্ণ—মেয়ের জন্য তাকে আর ভাবতে হবে না।

পাঁচ

সেই বিরাট দেহ লম্বকর্ণ একদিন সকালে বার হয়ে আর ফিরলো না।

সেদিন রাত কেটে গেল, তারপরদিন রাতও কেটে গেল। হিড়িম্বা আকুল হয়ে উঠলো ভাবনায়, সে কাঁদতে লাগলো।

একত্রে থাকতে থাকতে রাক্ষস কন্যা হিড়িম্বা ও মানুষ পুত্র রামচন্দ্রের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে উঠেছিল, পরস্পরের কথাবার্ত্তাও তারা বুঝতো, এই দীর্ঘ পাঁচ ছয় মাসে হিড়িম্বা মানুষের ভাষা ও রামচন্দ্র রাক্ষসের ভাষা চেষ্টা করে শিখেছিল।

হিড়িম্বাকে কাঁদতে দেখে রামচন্দ্রের চোখেও জল আসে, সে হিড়িম্বাকে সান্ত্বনা দেয়—"ভয় নেই, তোমার বাবা ভালোই আছে। কোথাও কোন কাজে আটকে পড়েছে, দু চারদিন পরে নিশ্চয় ফিরে আসবে।"

হিড়িম্বা ততই কাঁদে, বলে, "না, তুমি জানো না! পুতুল, তোমার দেশের মানুষেরা বাবাকে জ্যান্ত ধরবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। বাবা আজ কয়দিন আগে বলেছিল এই বনের বাইরে যে রাজ্য আছে, সেখানকার মানুষেরা কি একটা জাল বুনেছে। আকাশে যে জাহাজ ওড়ে, ওরা নাকি সেই জাহাজ হতে সেই জাল ছড়িয়ে দেবে বাবার ওপর—তা হলেই বাবা বন্দী হবে.—সে জাল নাকি লোহার তৈরী, বাবা ছিঁড়তে পারবে না। বাবা যখন তিনদিনের মধ্যে ফিরলো না, নিশ্চয় সেই জালে বাবা ধরা পড়েছে—নইলে বাবা কক্ষনো এতদিন কোথাও থাকে না। যেখানেই যাক, রাত্রে নিশ্চয়ই ফিরে আসে।

বনের বাইরের রাজ্য—

রামচন্দ্র জানে—সে রাজ্যের রাজা তার পিতা রাজা বীরবাহু। ছয়মাস আগে তিনি বনে এসে একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছেন—তিনি প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য উন্মত্ত

হয়েছেন। পিতা নিশ্চয় জেনেছেন—রামচন্দ্র বেঁচে নাই—রাক্ষসের হাতে বন্দী রামচন্দ্র বেঁচে থাকতে পারে না।

আর মা—রামচন্দ্রের দুর্ভাগিনী মা—তিনি কি করছেন— ? হয়তো আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছেন, দিন রাত তার নাম করে কাঁদছেন—

দুই হাতে মুখ ঢেকে রামচন্দ্র হু হু করে কেঁদে ওঠে। দুজনেই কাঁদে—কে কাকে সান্ত্বনা দেবে ?

বেচারা হিড়িম্বা—আজ সারাদিন তার খাবার নাই—পিতা একটা গণ্ডার মেরে রেখে গিয়েছিল, পরশু আর কাল সেই গণ্ডারের মাংস চলেছে, আজ তার খাদ্য নাই। রামচন্দ্রের আহার্য্য সে যোগাড় করে আনে,—জীবজন্তু মারতে সে আজও শেখেনি। গুহার সামনে দিয়ে কাল বিকেলে হাতীর পাল চলে গেল, ভয়ে তার পুতুলকে নিয়ে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রইলো হিড়িম্বা।

আজ সকালে রামচন্দ্রের অনুরোধে কেবল ক্ষুধার জন্যই তিন কাঁদি পাকা কলা খেয়ে তাকে জলযোগ করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কিন্তু এ সব নিরামিশ আহার্য তার মোটেই ভালো লাগে না।

রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাকে বুঝায়, "তুমি এক কাজ করো হিড়িম্বা,—আমায় যদি এই বনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দাও, আমি মানুষের রাজ্যে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসি। যদি তোমার বাবাকে বন্দী করা হয়ে থাকে, যাতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, আমি তা করব। মানুষের রাজ্যে সবাই আমায় চেনে, তোমার কোন ভয় নেই।"

হিড়িম্বা ভয় পায়—পুতুল যদি একেবারে চলে যায়, যদি আর ফিরে না আসে।

কিন্তু তার বাবা,—তাকে নিশ্চয় মানুষেরা বন্দী করেছে, হয়তো মেরে ফেলবে—তখন হিড়িম্বার কি উপায় হবে ?

কাঁদতে কাঁদতে হিড়িম্বা রাজি হয়।

বললে, "চল, তোমায় বনের ধার পর্যন্ত পৌঁছে দেই, আমি ওখানেই থাকব। কিন্তু তুমি কথা দাও, মানুষেরা যদি আমার বাবাকে ধরে থাকে, তুমি বাবাকে ফিরিয়ে দেবে— ?"

"হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি—"

রামচন্দ্র কথা দেয়।

হিড়িম্বা পুতুলকে কাঁধে তুলে নেয়, তারপর লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলে মানুষের রাজ্যের দিকে।

ছয়

নগরে ঢুকতেই রামচন্দ্র দেখতে পায়—দলে দলে লোক ছুটছে তাদের বাড়ীর দিকে। সে যে তাদের রাজকুমার তা লোকে ভুলে গেছে, তাই সে যখন জিজ্ঞাসা করে,—"তোমরা রাজবাড়ী যাচ্ছো কেন—" তখন কেউ কোন উত্তর দেয় না।

অবশেষে উত্তর মিললো এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার কাছে "জানো না খোকাবাবু, পরশু বিকেলে সেই রাক্ষসটা আমাদের জালে ধরা পড়েছে। এত অত্যাচার তার যা বলা যায় না। রাজার অনেক সৈন্যকে খেয়েছে, রাজপুত্রকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় মেরে ফেলেছে। তারপরেও প্রায় নিত্য সহরের আশপাশ থেকে মানুষ গরু ঘোড়া হাতী যা পাচ্ছে ধরে নিয়ে খেয়ে যাচ্ছে যাতে সহরের অর্দ্ধেক জীবজন্তু মানুষ শেষ হয়ে গেছে।

অনেকদিন ধরে মোটা তার দিয়ে এই মস্ত বড় জাল তৈরী হয়েছে। এই জাল নিয়ে চারখানা উড়োজাহাজ উঠে, রাক্ষস যখন ফিরে যাচ্ছে তখন তার উপর ফেলতেই সে জাল আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে রাক্ষসটাকে। রাজবাড়ীর ও পাশে যে উপবন আছে সেইখানেই পড়ে আছে রাক্ষসটা। রাজার কাছে কাল বিচার হয়েছে, আজ তাকে হাজারটা কামান চারদিকে ঘিরে একসঙ্গে হাজার গোলা ছুড়ে মেরে ফেলা হবে, সেই মজা দেখতে সমস্ত লোক ছুটছে।"

আর একটু দেরী করে না রামচন্দ্র, ছুটতে ছুটতে উপবনের ধারে উপস্থিত হয়।

একপাশে তার পিতার সিংহাসন, সেখানে তিনি বসেছেন, চারিদিকে পাত্রমিত্র, সেনাপতি মন্ত্রীগণ। সেদিকে সহরের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। গোলাকার উপবনের

মাঝখানে তারে জড়িত রাক্ষস লম্বকর্ণ চিত হয়ে পড়ে আছে, বিরাট তার দেহ,—সমস্ত উপবনটা সে ঢেকে ফেলেছে। উপবনের চারিদিকে পাতা হয়েছে হাজার কামান, হাজার গোলন্দাজ অপেক্ষা করছে—একটা সঙ্কেত পাওয়ামাত্র তারা তোপ দাগবে।

জনতার মধ্য দিয়ে ছুটে গিয়ে রামচন্দ্র পিতাব কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে; চেঁচিয়ে ওঠে—"বাবা—"

"কেরে, কে—"

রাজা মন্ত্রী সেনাপতি, পাত্র মিত্র সবাই সচকিত হয়ে ওঠেন—"কে—কে—কে—"

"বাবা—আমি—আমি রামচন্দ্র। আমি মরিনি বেঁচে ফিরে এসেছি।"

পিতা রামচন্দ্রকে বুকে টেনে নেন, চোখের জলে রামের মাথা ভিজে ওঠে। অন্তঃপুরে খবর পেয়ে রাণী ছুটে আসেন—"রাম—আমার রাম"

ওদিকে সংকেত দেওয়ার সময় হয়েছে।

হাত তোলে রামচন্দ্র—"না, গোলা ছোড়া হবে না।"

তারপর একে একে সব কথা বলে। লম্বকর্ণের মহত্ব, তার মেয়ে হিড়িম্বার উদারতা—বলতে বলতে তার চোখে জল আসে।

সে বললে, "আমি হিড়িম্বাকে কথা দিয়েছি বাবা—তার বাবাকে ফিরিয়ে দেব, আমার কথা রাখতে দাও।"

লম্বকর্ণের মুক্তির আদেশ হল।

দর্শকেরা যে যেখানে ছিল—সবাই পালালো। জাল হতে মুক্ত হয়ে হয়তো ক্ষুধাতুর লম্বকর্ণ এক এক গ্রাসে দশ বারো জন মানুষ খেয়ে ফেলবে। রাক্ষস জাতকে বিশ্বাস করা চলে না।

পিট পিট করে তাকাচ্ছিল লম্বকর্ণ—রামচন্দ্রকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

রামচন্দ্র জালের কাছে দাঁড়াল, লম্বকর্ণের জাতীয় ভাষায় বললে, "লম্বকর্ণ, বাবা তোমায় মুক্তি দিয়েছেন। তোমায় বন্ধন হতে মুক্ত করা হচ্ছে, তুমি বার হয়ে

বনের ধারে হিড়িম্বা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তার কাছে যাবে। আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি তোমায় মুক্তি দিয়ে তার কাছে ফিরিয়ে দেব, সে তোমায় নিয়ে অন্য বনে চলে যাবে।”

রামচন্দ্রের আদেশে কয়েকজন লোক সভয়ে এগিয়ে এসে জালের বাঁধন কেটে দিয়ে ছুটে পালাল।

কাটা জালের মধ্য হতে বার হয়ে এলো সাক্ষাৎ যমের মত আকৃতি লম্বকর্ণ—কিন্তু সে বড় শান্ত।

রামচন্দ্রকে হাতে করে তুলে সে তার মাথায় একটা চুমো খেলে, আর্দ্র কণ্ঠে বললে, “তুমি আমায় বাঁচিয়েছো, আমার মেয়ের সঙ্গে খেলা করে তাকে ভুলিয়ে রেখেছো, তোমার কথা আমি কোনদিন ভুলব না। হিড়িম্বাকে যেমন তুমি কথা দিয়েছো, সেও তেমনি তোমায় কথা দিয়েছে, তার কথা রাখতে আমি তাকে নিয়ে আমার নিজের দেশ লঙ্কায় আজই ফিরে যাব—আর তোমাদের এদিকে আসব না। তোমরা সুখ শান্তিতে বাস কর এই কামনা করে যাচ্ছি।”

রামচন্দ্রকে সাবধানে নামিয়ে দিয়ে লম্বকর্ণ বনের পথ ধরলো।

এরপর রাজ্যে ফিরে এলো সুখশান্তি, রাজা বীরবাহু আবার সুখে রাজ্য করতে লাগলেন।

ঘুমপুরী

এক

দুনিয়ায় সে গাছ কোথাও মেলে না,—একমাত্র এ ফুলের গাছ আছে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীর বাগানে। একটি মাত্র গাছ, তাতে প্রতিদিন একটি করে ফুল বারোমাস ফোটে।

ইন্দ্রদেবকে তপে সন্তুষ্ট করে রাজা চন্দ্রকেতু সেই গাছের একটি চারা পেয়েছিলেন। গোলাপ জলে সোনা গুঁড়ো করে মিশিয়ে সেই জল প্রতিদিন চারা গাছটির গোড়ায় সকালে ও বৈকালে দু-বার দু-বালতী দিতে হয়, তবেই গাছের বৃদ্ধি হয়।

বড় হয়ে উঠেছে গাছটি, ফুলের একটি কুঁড়ি ধরেছে। রাজা-রাণী এবং রাজ-পরিবারের প্রত্যেকের উৎকণ্ঠার শেষ নাই,—কুঁড়ি বড় হয়, তাঁরা পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন,—কবে ফুল ফুটবে।

এই ফুলগাছটি পাওয়ার আশায় চন্দ্রকেতু গোটা একটি বৎসর কঠোর তপ করেছেন যাতে ইন্দ্রদেবের আসন টলেছে, তাঁকে চন্দ্রকেতুর সামনে আসতে হয়েছে।

দেবতা জিজ্ঞাসা করেছেন—রাজার কি চাই, রাজা প্রার্থনা করেছেন একটি ফুল গাছের চারা।

ইন্দ্রদেব হেসেছেন, বলেছেন, "কতলোকে পৃথিবীর ঐশ্বর্য চায়, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চায়; কেউ কেউ আবার ইন্দ্রত্ব পদ প্রার্থনা করে। একমাত্র তুমিই ব্যতিক্রম চন্দ্রকেতু, তুমি চাও কেবল একটি ফুল গাছ। বেশ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে, ফুল গাছের ছোট একটি চারা তুমি পাবে। আমার স্বর্গোদ্যানের মালি চারা তোমায় এনে দিয়ে যাবে, কি ভাবে লাগাতে হয়, কি রকম যত্ন করতে হয়, সে তোমায় জানিয়ে দেবে ?"

ইন্দ্রদেব অদৃশ্য হলেন।

তারপর দিন রাজা চন্দ্রকেতু স্নান করে পট্টবস্ত্র পরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইন্দ্রদেবের স্বর্গোদ্যানের মালী মহীরথ সেই ঘরে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠলো, সোনার টবে একটি ছোট্ট চারা গাছ তার হাতে।

রাজা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে টবসুদ্ধ চারা গ্রহণ করলেন। দেবমালি বলে দিলে—"বাগানে এক জায়গায় হোম করে তারপর সেইখানে মাটি খুঁড়ে এই টব-সুদ্ধ চারা গাছটি বসাতে হবে। প্রতিদিন দুই বেলা গঙ্গাজলে গোলাপ দিয়ে সেই জলে সোনার গুঁড়ো মিশিয়ে চারা গাছের গোড়ায় ঢালতে হবে। প্রতিদিন দু-বার করে জল দিতে হবে। আর কেউ যেন অনাচার করে এই গাছ স্পর্শ না করে। অনাচার লাগলেই এ গাছ শুকিয়ে যাবে—রাজা এটা যেন মনে রাখেন।"

এরপর রাজ পুরোহিত প্রতিদিন স্নান করে এসে এক বালতী গঙ্গাজলে অজস্র গোলাপ ফুল ও স্বর্গরেণু মিশিয়ে দুইবেলা গোড়ায় ঢালেন। রাজা-রাণী স্নানান্তে এসে প্রতিদিন দুইবেলা প্রণাম করেন।

এই ফুল ফুটলে এর সৌরভ গ্রহণ করে রাজা-রাণী অমর হবেন, তাদের একমাত্র ছেলে অমর হবে, সারা পৃথিবী সে জয় করবে, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে সে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাজা-রাণী প্রতিদিন দেখেন—কবে ফুল ফুটবে।

দুই

গাছে কুঁড়ি ধরেছে—

রাজা-রাণী ও আত্মীয়স্বজনের স্বস্তি নাই। বাগান ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র প্রহরী বর্গ,—মানুষ পাখী, জীবজন্তু কাউকে বাগানের সীমানায় আসতে দিচ্ছে না।

রাজা-রাণী ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আসেন, সতৃষ্ণ নয়নে ফুলটার পানে তাকান, কবে কখন কোন মুহূর্তে রূপে গন্ধে অতুল সৌন্দর্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে ফুলটি,—সেই কেবলমাত্র ফুটে ওঠা ফুলটিকে সোনার কাঁচি দিয়ে সন্তর্পণে কেটে সোনার পাত্রে রাখবেন রাজা-রাণী, নিজেরা সে ফুলের আঘ্রাণ নেবেন, একমাত্র কিশোরকুমার নরনারায়ণকে দেবেন।

আস্তে আস্তে পাপড়ি খোলে ফুলের—

সন্ধ্যার দিকে আলো ধরে রাজা-রাণী দেখতে পান গুটি তিন চার পাপড়ি খুলেছে; রাতারাতি সব পাপড়ি খুলে যাবে, ভোরের দিকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে।

রাজা-রাণী ঠিক করেন—আজ এই বাগানে তাঁরা জেগে পাহারা দেবেন। যে মুহূর্তে ফুলটি ফুটবে, রাজা কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে পাত্রে রাখবেন।

প্রথম এই ফুলটিতে আছে অমোঘ শক্তি, প্রতি পাঁচবৎসরের ফোটা ফুলে সে শক্তি থাকবে না, তাই রাজা-রাণী অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

গাছতলায় তুখানা আরাম কেদারা রাখা হল, নিচে পাতা মূল্যবান গালিচা। রাজা-রাণী আরাম কেদারায় বসলেন, নিচের গালিচার উপর কিংখাপের বিছানা বিছিয়ে কিংখাপ মোড়া উপাধানে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো রাজকুমার, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত বাড়ে—

রাজা-রাণীর চারিদিকে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র দেহরক্ষী, যদি রাজা-রাণীর চোখে ঘুম নামে, তারা জাগিয়ে দেবে। তারা সতত-সতর্ক প্রহরী, ঘুমকে তারা জয় করেছে।

এটা তো জানা কথা—কারও চোখে ঘুম নামলেও সবাই কিন্তু একসঙ্গে ঘুমাবে না। ফুল চুরি করতে কেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে সে বোম ছুড়বে, বোমের শব্দে চারিদিক হতে সশস্ত্র প্রহরীরা ছুটে আসবে।

রাজা-রাণী পাশাপাশি বসেন।

রাজা বলেন, "কুমার ঘুমিয়েছে ঘুমাক, দেখো আমরা যেন না ঘুমাই। এই সব সিপাই শান্ত্রীদেরও আমি বিশ্বাস করিনে—কে বলতে পারে—আমাদের ঘুমের সময় কেউ ফুলটাকে তুলে নিয়ে ঘ্রাণ নেবে—বাস, আর দেখতে হবে না। তখন সে হবে অমর, সারা পৃথিবীর উপর হবে তার আধিপত্য, আমাদের তখন কেউ চিনবে না রাণী।"

রাণী বলেন, "খুব সাবধান রাজা, চোখে যেন ঘুম না আসে, যেমন করেই হোক তোমায় আমায় জেগে থাকতেই হবে। আমার চোখে রাত এগারোটায় ঘুম আসে,--তুমি আমায় তখন জাগিয়ে দিয়ো।"

পরস্পর সাবধান হয়ে বসেন।

রাত এগারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে রাণীর চোখে রাজ্যের ঘুম নামে, রাণীর মাথা রাজার কোলে ঢুলে পড়ে। রাজা এত ঝাঁকি দেন, চুল ধরে টানেন, রাণীর ঘুম ভাঙ্গে না।

মুস্কিল,—রাজার চোখেও ঘুম নামে যে—।

দুহাতে চোখ ডলেন রাজা,—না, ঘুমালে চলবে না, কে জানে এদেরই মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক তাঁর ঘুমের অবকাশে যদি ফুলটাকে তুলে ঘ্রাণ নেয়—

মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে, রাজা উঠবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উঠতে পারেন না। অবিলম্বে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, তাঁর মাথাটা রাণীর মাথার উপর ঝুলে পড়ে।

অস্ত্রধারী দেহরক্ষীরাও দাঁড়িয়ে ঝিমায়,—তারপর কখন বসে পড়ে কাত হয়ে হয়ে ঘুমায়—। বাইরের প্রহরীদেরও সেই অবস্থা—

একটানা সাঁ সাঁ শব্দ শোনা যায়, সেই শব্দে ঘুম আরও গাঢ় হয়—কারোও কোন জ্ঞান থাকে না।

দুটি পাখায় ভর দিয়ে পরম সুন্দরী পরীরাণী নেমে আসে, খানিক সকলের দিকে তাকিয়ে সে হেসে উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে ফুলের ডালটা নিচু করে কেবলমাত্র বিকশিত ফুলটিকে ছিঁড়ে নিয়ে নিজের বুকে রাখে, তারপর দুই পাখা মেলে সে সাঁ সাঁ করে উড়ে গেল।

তিন

পূবে কেবল ফরসা হয়ে এসেছে—ধড়ফড় করে জেগে উঠলেন রাজা—রাণীকে একধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলে তিনি ছুটে যান ফুল গাছের কাছে--

হায় হায়, কোথায় সে ফুল—কই সে ফুল? কাল রাত দশটার পরে ও দেখেছিলেন মাত্র তিনটি পাপড়ি মেলেছে, বাকি পাপড়ি ভোরের মধ্যে খুলে যাবে এই কথাই তিনি ভেবেছিলেন।

রাজা চীৎকার করে ওঠেন—"কে--কে নিয়েছে সেই ফুল—বল শিগগীর বল—নইলে সকলের গর্দানা কাটব, কাউকে বাঁচতে দেব না।"

অস্ত্রধারী দেহরক্ষীগণ, রাণী, রাজকুমার, বাগানের বাইরে দণ্ডায়মান প্রহরীগণ সবাই জেগে উঠেছে—

সবাই শুনছে—ফুল খোয়া গেছে। ফুলের বোঁটা কাটা—গাছ রয়েছে, ফুল নাই। মুখ শুকিয়ে যায় সকলের, একি সর্বনাশ, সিপাই শান্ত্রী ঘেরা বাগান, রাজা-রাণী নিজে ফুল পাহারা দিচ্ছেন, এখান হতে ফুল চুরি যাওয়া সম্ভব কি? এ মানুষের কাজ নয়, মানুষের এতখানি সাহস কখনও হতে পারে না। এ নিশ্চয় যক্ষরক্ষ, কিন্নর, বা প্রেত প্রেতিনীর কাজ।

কিন্তু রাজাকে সে কথা বুঝাবে কে?

তাঁর বহু সাধনার ধন এই গাছ, এর প্রথম ফুলটির উপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি,—সেই ফুল কে চুরি করলে?

রাজা যেন পাগল হয়ে গেছেন, কাউকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না—এমনকি রাণী রাজকুমারকেও সন্দেহ করছেন।

সিপাই শান্ত্রী দেহরক্ষী সকলকে তিনি বন্দী করলেন—এমনকি রাণী রাজকুমারকেও রাজান্তপুরে প্রায় বন্দী অবস্থায় থাকতে হল। নিজে তিনি প্রত্যেক দেহরক্ষীর পোষাক তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন, ফুল কারও কাছে পাননি।

রাজা রাজদরবারে এসে কঠিন আদেশ দিলেন—তিনি সাতদিন অপেক্ষা করবেন—এর মধ্যে ফুল না পাওয়া গেলে যে সব দেহরক্ষী তাঁর কাছে ছিল, বাগানের বাইরে যে সব সিপাই পাহারা দিচ্ছিল, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হবে।

তিনি সন্দেহ করেন—এদের মধ্যে কেউ কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তাঁদের সকলকে ঘুম পাড়িয়ে সেই অমূল্য ফুলটি অপহরণ করেছে। কিন্তু তিনি রাজা, সহজে কাউকে ছাড়বেন না—

তিনি জানেন—প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর আবার একবার এই ফুল একটিমাত্র ফুটবে! স্বর্গোদ্যানে এ ফুল প্রতিদিন একটি করে ফোটে। মাটির পৃথিবীতে ফুটবে একটি করে—প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর!

একে একে দিন যাবে—মাস যাবে—বৎসর যাবে, পাঁচবৎসর গেলে যেদিন সেই ফুলটি ফুটবে—কে জানে এবারকার মত সেদিন ও সে ফুল অপহৃত হবে কিনা।

একদিন—দুদিন করে ছয়দিন কেটে যায়, সাতদিন আসে। সূর্য্যাস্তের মধ্যে সন্ধান না পেলে বধ্যভূমিতে বন্দীদের হত্যা করা হবে—।

দিন চলে যায়—

বন্দীরা প্রস্তুত হয়। তারাও ঘুমিয়ে পড়েছিল—কেউ জানে না কে সে ফুল অপহরণ করলে।

তবু তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়।

একে একে সব বন্দীদের জেলখানার বাইরে আনা হয়, হাতে পায়ে শিকল দিয়ে তারা চলে বধ্যভূমির পানে। রাজা আগেই গিয়েছেন, শেষবার তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারপর তাদের সামনে আসবে মৃত্যু—।

কেউ একটি কথা বললে না, নীরবে নতমুখে মৃত্যুর দিকে তারা এগিয়ে চললো—

"থামো—থামো রাজা, এদের কোন দোষ নেই—"

হাঁফাতে হাঁফাতে হাত তুলে এসে দাঁড়ায় একটি কিশোর বালক, রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "আমি জানি ফুল কে নিয়েছে।"

"তুমি জানো—তুমি ?"

রাজা শুধু নন, পাত্র মিত্র, উজির সেনাপতি, সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন।

বালক বললে, "হ্যাঁ আমি জানি। আমি পথের লোক, গান গেয়ে ভিক্ষা করে যা পাই তাতে আমার দুঃখিনী মা আর আমার দিন চলে। আমার বাড়ী ঘর নেই, গাছতলায় আমরা মা ছেলে পড়ে থাকি। যেদিন আপনার ফুল চুরি যায় সেদিন এই বাগানের খানিকদূরে যে পাহাড়টা আছে ওরই পাশে আমরা শুয়েছিলাম। মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আমি ঘুমাই নি। মাঝ রাত্রে চোখে আলো এসে পড়ায় চেয়ে দেখলাম একটি পরী নেমে আসছে, সাঁ সাঁ করে তার পাখার শব্দ হচ্ছে, তার পাখায় কত হীরা জহরত জ্বলছে। ওই পাহাড়ের উঁচু জায়গা হতে দেখলাম—তার পাখার হাওয়া যতদূর গেল—সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল। দেখলাম আপনার সিপাই শান্ত্রীরা ঢুলে পড়লো, বাগানের মধ্যে আপনারা সবাই ঢুলে পড়লেন। পরী ফুল গাছ হতে চমৎকার ফুলটি ছিঁড়ে নিয়ে নিজের বুকে রাখলো, তারপর চারিদিকে থু থু করে থু থু ছিটিয়ে আবার সাঁ সাঁ করে উড়ে চলে গেল।"

রাজা একেবারে পাথর, লোকজন সব নিঃশব্দ। বন্দীরা মুক্তি পেলে,—রাজা ম্লান মুখে ফিরলেন।

চার

কিন্তু কোথায় সে পরীর দেশ,—সেই পরী রাণীকে যেমন করে হোক জব্দ করতেই হবে—রাজার কঠিন প্রতিজ্ঞা।

রাজার গুরু কাপালিক—উজ্জয়িণীর শ্মশানে তিনি সাধনা করেন

রাজার লেখা নিয়ে অশ্বারোহী ছুটলো গুরুকে নিয়ে আসবার জন্য। এই

ফুলের কথা রাজা চন্দ্রসেন গুরুর মুখে শুনেছিলেন, সাধনার পদ্ধতিও তিনি শিখিয়েছিলেন।

শিষ্যের কথা শুনতে পেয়ে গুরু তখনই চলে এলেন তাঁর কাছে।

পরীর কাহিনী তিনি শুনলেন।

গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ, সেই পরীরাণীর কথা আমি জানি। একদিন সেও এই ফুলের সন্ধানে আমার কাছে গিয়েছিল কারণ ইন্দ্রকে তুষ্ট করার মন্ত্র কেবল আমিই জানি, আর কেউ জানে না। ইন্দ্রের স্বর্গপুরীতে যাওয়ার অধিকার তার নাই—অথচ এই ফুল না পেলে তার পিতাকে সে বাঁচাতে পারবে না। এই ফুল অপহরণ করতে গিয়ে তার পিতার সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়। ইন্দ্র তাকে বজ্রবাণ মেরেছিলেন। তার সমস্ত হাত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে, তবু নেহাৎ দানব বলেই মরেনি, আজও বিছানায় পড়ে আছে। সেই দানবের মেয়ে এই পরীরাণী তাকে বাঁচাতে চায়, সেইজন্য এই ফুল তার দরকার। আমি তাকে মন্ত্র দেইনি, ওখান হতে তাড়িয়ে দিয়েছি। তারপর কোনসূত্রে সে পৃথিবীতে এই ফুলের কথা জানতে পেরে সন্ধানে ছিল ;—আমি যোগবলে জানতে পারলাম—এ ফুল সে নিয়ে গিয়ে তার পিতার মাথার পাশে রেখেছে।"

রাজা বললেন, "এর ফলে দানব আবার ভালো হয়ে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে ?"

গুরু বললেন, "না, ইন্দ্র স্বর্গ হতে এ দৃশ্য দেখে ফুলের যে শক্তি ছিল তা হরণ করেছেন, তাই সে ফুল দিয়ে কোন কাজ হল না। কিন্তু এর ফলে পরীরাণী ক্ষেপে উঠেছে, সে ভেবেছে তুমি এ ফুলের গুণ নষ্ট করেছো, সে জন্য সে যত পরী আর দানবদের এক করেছে—তোমার রাজ্য আক্রমণ করে তোমায় সবংশে ধ্বংস করবে, তোমার রাজ্য ধূলিসাৎ করে তবে তার শান্তি হবে।"

বিবর্ণ হয়ে যান চন্দ্রকেতু, গুরুর পা জড়িয়ে ধরেন, কাতরকণ্ঠে বললেন, "রক্ষা করুন গুরুদেব, পরীর কোপ হতে আমায় উদ্ধার করুন।"

গুরু প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, "তোমায় রক্ষা করবার জন্যেই আমি এসেছি বৎস। তুমি নদী তীরে যজ্ঞের আয়োজন কর।"

মালিনী নদীর তীরে আরম্ভ করলো যজ্ঞের আয়োজন।

দেশ বিদেশের সাধু সন্ন্যাসী এখানকার আমন্ত্রণ পেয়ে এলেন, বড় বড় রাজা মহারাজারা যজ্ঞ দেখতে এলেন। রাজার নগর রীতিমত সরগরম হয়ে উঠলো।

মালিনীর তীরে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞ আরম্ভ হল।

দিনের পর দিন চললো যজ্ঞে হবিদান, মন্ত্রোচ্চারণ ওদিকে পরীরাণীর আসন টলে।

তার পিতা শয্যাসহ এগিয়ে যায়, মন্ত্রের জোরে বিপুল আকর্ষণে সে যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর একে একে পড়ে দানবেরা—

পরীরাণী থাকতে পারে না—

একটি সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে সে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়।

রাজা চন্দ্রকেতুর সিংহাসন মূলে সে করযোড়ে লুটিয়ে পড়ে, "রক্ষা করুন মহারাজ, আমি অন্যায় করেছি, পাপের শাস্তি আমাকে দিন; নির্দ্দোষীদের মারবেন না।"

ছোট মেয়েটীর কাতর অনুনয়ে রাজার মন বিগলিত হয়, তিনি বলেন, "ভয় নেই মা, তুমি যখন আমার শরণ নিয়েছো, আমি তোমায় রক্ষা করব।"

গুরু মন্ত্র পড়া স্থগিত করে শিষ্যের পানে তাকান, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "এ কি করছো চন্দ্রকেতু? যে মেয়েটিকে তুমি আশ্রয় দিচ্ছো, সে পরীরাণী। ওর জন্যেই যে এই বিরাট যজ্ঞের আয়োজন, ওকে ছেড়ে দাও, আমি যজ্ঞে শেষ হবি দান করি।

রাজা চন্দ্রকেতু হাতযোড় করলেন, "গুরুদেব, হোক এ আমার পরম শত্রু পরীরাণী, তবু আমি একে আশ্রয় দিয়েছি, একে আমি যজ্ঞের আগুনে দগ্ধ হতে দেব না। আমায় আমার সর্বস্বের বিনিময়ে আশ্রিতা মেয়েটিকে ভিক্ষা দিন গুরুদেব।"

জনগণ স্তম্ভিত চোখে রাজার পানে তাকিয়ে থাকে।

গুরুর দুইচোখে আগুন জ্বলে, বললেন, "কিন্তু তুমিই আমায় যজ্ঞ করতে বলেছো রাজা—"

রাজা নতজানু হন, রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "গুরুদেব, রাজা শিবি আশ্রিতকে রক্ষা করতে নিজের হাতে গায়ের মাংস কেটে দিয়েছিলেন, আমি আমার আশ্রিতকে রক্ষা করতে আমার রাজসিংহাসন, রাজমুকুট আপনার চরণে দান করলাম। পরী-রাণী একদিন আমার শক্রতা করলেও আজ সে আমার আশ্রিতা, আজ আমি তার পিতা, সে আমার কন্যা, আমি আমার জীবন দিয়েও তাকে রক্ষা করব গুরুদেব।"

সহস্র সহস্র লোক স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—"জয় মহারাজ চন্দ্রকেতুর জয়—"

গুরু আসন ত্যাগ করেন—

শিষ্যের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় হাত রাখেন—ক্রোধ তাঁর দূর হয়েছে—

বলেন, "তাই—তাই তুমি মহারাজ চন্দ্রকেতু, তোমার অমানুষিক হৃদয়ের বল, অমর হওয়ার বাসনা তোমার ক্ষমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে, তোমার ত্যাগের মাহাত্মে তুমি মহৎ, তুমি গরীয়ান। আশীর্বাদ করি—তোমার কর্ম তোমায় অমরত্ব দান করবে—তোমায় সকলের উপরে স্থাপন করবে।"

পরীরাণীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সে গুরুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে।